KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ সর্বরী চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীরদ ওঝা
Title দেওয়াং	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২০/৫ ২০/৭ ২০/৮ ২০/১০	Year of Publication ভাদ্র ১৩৯৬ // Sep 1989 কার্তিক ১৩৯৬ // Nov 1989 অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ // Dec 1989 মাঘ ১৩৯৬ // Feb 1990 Condition : Brittle Good
Editor : অরুণ ওঝা	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৫০ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮৯

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাম্প্রতিক সংকটাবস্থা নিয়ে প্রবীণ মার্কসবাদী, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আশাবাদী ভাষ্য ঃ "বিপ্লব : সংকট নয়, চাই সন্ধান, শুদ্ধি, সংকল্প"।

সমাজতন্ত্রী নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেবের জন্মশতবর্ষে তাঁর কর্মজীবনের রাজনৈতিক মূল্যায়ন, বিশেষ করে জাতীয় বাম বিকল্পের পরিণতি নিয়ে ড· প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ।

বিশ শতকের বাঙলা উপন্যাসে ভাববস্তু আর রচনারীতির ক্ষেত্রে যেসব নতুন উপাদান যোগ করেছেন ঔপন্যাসিক গোপাল হালদার, সেসবের সম্যক পরিচয়বাহী সন্দর্ভ "সমকালীন ইতিহাসের কথাকার"। সন্দর্ভটি সদ্যঃপ্রয়াত অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের রচনা।

প্রমুখ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথম যৌবন থেকেই বাঙলা ছন্দের রূপনির্ণয়ে উদ্যোগী হলে সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন অনুজকে। সেই অনুজ ড· সুধীর সেনের বিবৃতিতে প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোজিজ্ঞাসার আদিপর্বের কথা।

ব্রিটিশ কলকাতার আদিপর্বে এখানে ফারসি ভাষা-সাহিত্য অনুশীলনের যে উন্নত পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, তার মূলে শুধু মুসলমানের নয়, হিন্দু এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের উৎসাহও ছিল অপরিসীম। কলকাতা-তিনশো উপলক্ষে সেই গৌরবোজ্জ্বল ফারসি চর্চার তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস স্মরণ করেছেন ড· আবদুস্ সোব্হান।

হুমায়ুন আজাদ—মৃণাল নাথের বিতর্ক নিয়ে আরো কিছু চিঠিপত্র।

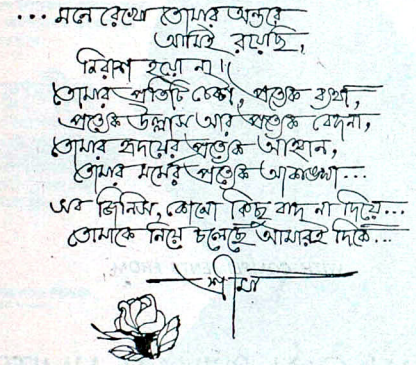

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ৭
নভেম্বর ১৯৮৯
কার্তিক ১৩৯৬

বিপ্লব : সংকট নয়, চাই সন্ধান, শুদ্ধি, সংকল্প হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৬৩
প্রবোধচন্দ্র সেন ও বাঙলা ছন্দ সুধীর সেন ৫৭৪
নেহরু, নরেন্দ্র দেও ও জাতীয় বাম-বিকল্পের পরিণতি প্রণব চট্টোপাধ্যায় ৫৯৭
কলকাতায় ফারসি চর্চা আবদুল সোবহান ৬১৯

দ্বীপচিহ্ন কিরণশঙ্কর মৈত্র ৫৭০
চিহ্নিত তিনি রেজাউদ্দিন স্টালিন ৫৭১
চিত্রশালা সুজন হাজারী ৫৭২
অতৃপ্তি সৈয়দ সমিহুল আলম ৫৭৩

রেবতীমোহনের একটুকরো মাটি গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯০

গ্রন্থসমালোচনা ৬০২
অলোক রায়, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, অমিতাভ রায়, সুব্রত সরকার,
দীপংকর চট্টোপাধ্যায়, মধু / সুবজিৎ দাশগুপ্ত

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৬২১
সমকালীন ইতিহাসের কথাকার বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

স্মরণে ৬৩৭
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

মতামত ৬৪০
অরূপ সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোঃ সানাউল্লাহ্

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নিবাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নারা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

D. T. M. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

59B CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA
Phone : 43-3093

বিপ্লব : সংকট নয়, চাই সন্ধান, শুদ্ধি, সংকল্প

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কার্ল মার্কসকে নিয়ে একটা গল্প আছে যে, সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থায় গৃহস্থালির কাজ কাকে কিভাবে করতে হবে এ সম্পর্কে কিছু হালকা কথা-বার্তার মাঝখানে এক মহিলা বলে ওঠেন : 'দেখুন ডক্টর মার্কস, যখন সকলের সমান অধিকারের যুগ আসবে তখন আপনার খানদানি হাবভাব আর ধরন-ধারন নিয়ে কি খাপ খাওয়াতে পারবেন?' ছদ্মগাম্ভীর্যসহকারে মার্কস বুঝি জবাব দেন : 'আমারও মনে সন্দেহ, তবে কিনা সে যুগ আসবে নিশ্চয়, শুধু তার আগেই আমি চলে যাব!'

১৯১২ সালে তৎকালে বিখ্যাত মাসিক "মডার্ন রিভিউ" পত্রিকায় ভারতমুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে পুরোধাদের অন্যতম হরদয়াল মার্কসকে আখ্যা দিয়েছিলেন : "আধুনিক যুগের ঋষি"। ঋষিদের ত্রিকালদর্শী বলেই বর্ণনা সবাই শুনে এসেছি, আর সমাজের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টারূপে মার্কসকে এভাবে চিহ্নিত করেন হরদয়াল। ১৮৪৮ সালের "কমিউনিস্ট ইশতেহার" হল মূলত কার্ল মার্কস-এর রচনা (অবশ্য যথারীতি এঙ্গেলস-এর সহায়তা নিয়ে); একেই পরবর্তী কালে স্টালিন বলেছেন, 'মার্কসবাদের Song of Songs' (ভগবানকে বাদ দিয়ে "ভগবদ্গীতা" আর কী!); এতেই আছে সেই বহুবিশ্রুত নির্ঘোষ : 'মেহনতি মানুষের পক্ষে হারাবার কিছু নেই তাকে বেঁধে রাখার শিকলগুলি ছাড়া। গোটা দুনিয়া জয় করতে সে চলেছে। জগৎ জুড়ে মেহনতি মানুষ এক হও।'

'কাব্যি' করতে না চাইলেও 'আসিবে সেদিন আসিবে' ছিল মার্কস-এর ভবিষ্যদ্বাণী। কবে আসবে, ঠিক কিভাবে আসবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি খবর দেওয়া তাঁর 'কর্ম' ছিল না, নক্ষত্রবিদ্বান্ জ্যোতির্বিদের ভূমিকায় তিনি নামেন নি। সমাজের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে সন্ধান করেছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকরণ নিয়ে। তাই প্রতীক্ষিত বিপ্লবের দিনক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হন নি। তার চেহারা কেমন কোথায় হবে তার ছক কাটতে বসেন নি। প্রথম দিকে মার্কসীয় চিন্তা আর কর্মপ্রয়াসের ভিত্তিতে অনুমান ছিল যে ধনতন্ত্রের হিসাবে অগ্রসর কোনো দেশে সোশালিস্ট বিপ্লব প্রথম সাফল্য অর্জন করতে পারবে। এমনও আশা কিছু পরিমাণে ছিল যে ইংলনড বা হলানড-এর মতো দেশে হয়তো বা প্রচলিত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এবং অপরিহার্য গণ-অভ্যুত্থানকে রক্তাক্ত সংগ্রাম থেকে মোটামুটি দূরে রেখেই বিপ্লব ঘটতে পারে। 'সে গুড়ে বালি' দিল ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ; জীবন এতকাল ধরে

এমনভাবে চলেছে যে সৎ আদর্শ আর শুভ অভিপ্রায়ের জোরে স্বার্থপরায়ণ সমাজকর্তৃত্বকে মূলোৎপাটিত করার মূল্য দিতে হয় প্রচুর আর প্রচণ্ড। মার্কস-এঙ্গেলস উভয়েই জীবনের শেষ দিকে জারশাসিত রুশদেশে বিপ্লবসম্ভাবনা লক্ষ করে উল্লসিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু সে-কথা থাক। ধনতন্ত্র বিবদমান সাম্রাজ্যশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় (যার বিশদ পর্যালোচনা করেন লেনিন) সম্ভাবনা দেখা দিল বিশ্বসাম্রাজ্যতন্ত্রের জগৎজোড়া শৃঙ্খলের সবচেয়ে দুর্বল গ্রন্থি ছিল যে রুশ-সাম্রাজ্যে, সেখানেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে (১৯১৭) আঘাত দিয়ে তাকে ছিন্ন করার সুযোগ। অকটোবর বিপ্লব। এভাবে ইতিহাসের আদি সমাজবাদী শাসনপ্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রাথমিক সূচনা দেখা দিল। এ ধরনের ঘটনা যে হতে পারে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত না হলেও এটা যে সম্ভব তা মার্কস-এঙ্গেলস-এর ঐতিহাসিক কল্পনা আর অনুমানে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯১৭ সালের বিপ্লব মার্কস-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যর্থ করেছে ভেবে বিদগ্ধজন যদি মজা পান তো নাচার।

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের দু-শো বছর বাদেও আজ নানা মহলে তার অবমূল্যায়ন যতই হোক না কেন, তার যুগান্তকারী মহিমা অস্বীকার করার মতো বাতুলতা অতি-বিদ্বানদের পক্ষেও সহজ নয়। শুধু ফরাসি সমাজজীবনের রূপান্তর নয়, সঙ্গে-সঙ্গে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'-র মন্ত্র নিয়ে, সর্ব-মানবের স্বাধিকারের নির্ঘোষ জানিয়ে, বাস্তব জীবনের তাগিদে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশফলে মানুষের মুক্তির নবমানসিকতার প্রেরণায় জনজাগরণের সংগঠিত শক্তিকে সমাজপরিবর্তনকর্মে লিপ্ত করে শুরু হয় এক "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ" (সোভিয়েট বিপ্লব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিধা)। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদেশে, ইয়োরোপে তো বটেই। আমাদের মতো মান্ধাতাগ্রস্ত দেশেও তার হাওয়া লেগেছিল, মুগ্ধ করেছিল ভারতে বিদেশী সাম্রাজ্য-লিপ্সু শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী টিপু সুলতানের মতো মানুষকে। কার্ল মার্কস তো একবার বলেছিলেন যে পশ্চিম জগতের লোভলোলুপ কর্ণধার যারা তারা চীনের মতো প্রাচীন বয়সেস্পূর্ণ দেশে গিয়েও দেখবে সেখানকার অতীত গৌরবকাহিনীর প্রোজ্জ্বলপ্রতীক যে মহাপ্রাচীর, তাতে খোদিত রয়েছে: 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'! জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানুষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার যুগযুগব্যাপী অভিযানে ফরাসি বিপ্লবের অনবদ্য অবদানের আলোচনা বহুতথ্যভিত্তিক ও বহুমাত্রিক এক বিষয়, যা এখানে সম্ভব নয়। শুধু মনে রাখা দরকার যে বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের তরঙ্গভেদ করে মানুষের ইতিহাসকে অগ্রসর হতে হয়েছে আর আজও গোটা দুনিয়ার চেহারা এমন যে দুশো বছরের পুরোনো ফরাসি বিপ্লবের সাফল্য পূর্ণ হতে পারে নি। ফরাসি বিপ্লবের মূল ধারাকেই নবযুগের পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়েছে যে সোভিয়েট বিপ্লব, সামন্তকর্তৃত্বকে বিলুপ্ত করে জনসমর্থনপুষ্ট বুর্জোয়া শাসন স্থাপনের পরিবর্তে সর্ববিধশ্রেণীকর্তৃত্ব উৎপাটিত করে শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত নবসমাজ যার অভীষ্ট, যুগান্তরসাধনকল্পে প্রায় অসাধ্যসাধনের অগ্নিপরীক্ষায় যাকে নামতে হয়েছে চিরবঞ্চিত নিঃস্ব মানুষের সংহত শক্তি সাহস আর সংগঠনে ভর করে, সেই সোভিয়েট বিপ্লব যে সর্ববিষয়ে সুস্পার্ক হবে সত্তর বছরে তা প্রত্যাশা করার মধ্যে ভ্রান্তি আছে।

এজন্যই খাস সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে কিংবা চীন থেকে (যার ১৯৪৯ সালের বিপ্লব বহু বৈকল্য সত্ত্বেও ইতিহাসে এনেছে বঞ্চিত মানুষের বিপুল বিজয়-বারতার হাওয়া) কিংবা পোলানড বা হাঙ্গেরি-র মতো বর্তমানে সোসালিস্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার কাজে নিরত দেশ থেকে যেসব খবর আসছে (প্রায়ই শত্রুপক্ষের প্রচারমাধ্যমের ভিত্তিতে হলেও, সঙ্গে-সঙ্গে সোজাসুজি তাদের কাছ থেকে) বলে সমাজবাদ-সাম্যবাদী মহলে কিঞ্চিৎ 'বিপন্ন বিস্ময়' দেখা দিতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন চলেছে সুপরিকল্পিত-

ভাবে এক চক্রান্ত (যা বহুরূপে বারবার দেখা দিয়েছে) যার মতলব হল মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদ-ভিত্তিক বিপ্লবপ্রয়াসকেই ইতিহাসে অসিদ্ধ ও বাস্তব জীবনে ব্যর্থ বলে নিন্দিত করা, সমসুযোগের সমাজকে অসার কল্পনা আর বিপ্লবকে কেবল রক্তক্ষয়ী বিপর্যয় আর অকল্যাণ বলে ধিক্কার দেওয়া—বিশুদ্ধ তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দেশ্যে নয়, আবহমান কাল থেকে অধিকাংশ মানুষের জীবনে যে অন্ধকার আর লাঞ্ছনা চলে এসেছে তাকেই একটু-আধটু মেরামত করে নিয়ে যে শোষণ-ব্যবস্থা চলেছে তাকে কায়েম করার জন্য।

ফরাসি বিপ্লবের কাল থেকে বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের পৌনঃপুনিকতা বহুবার দেখা গিয়েছে। 'বাস্তিল' দুর্গের পতনদিবসটিকে (১৪ জুলাই, ১৭৮৯) ফ্রান্সের জাতীয় উৎসবতিথি ঘোষণা করতে প্রায় নকই বৎসর লেগেছিল। সোভিয়েট বিপ্লবকে তো নিছক বেঁচে থাকার লড়াই করতে হয়েছে বহুকাল আর ১৯৪১-৪৫ সালের অকল্পনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রায়-অসম্ভব অবস্থার মধ্যে নিজের ঘর সামলাতে হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে দুনিয়া এগিয়ে চলেছে এমন বেগে যে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধোত্তর জগতে আজ প্রায় সর্বত্র রাজ-নৈতিক পরাধীনতা দূরীভূত। জাতীয় মুক্তি আর সোসালিজম-এর সাম্যিপ্য ও সৌহার্দ্য প্রায় সর্ব-স্বীকৃত। যারা চায় গোটা দুনিয়াতে সমাজবাদ-সাম্যবাদের বিজয়, তাদের মনে আসতে পারে আরও দ্রুত এবং নিশ্চিত অগ্রগতির অধীর আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু ইতিহাস তো কেবল আমাদের ইচ্ছাপূরণের দায়িত্ব রাখে না। মানুষের চেতনা আর উদ্যোগ আর সংকল্প আর সংগ্রামের উপর নির্ভর করছে তার গতি। মনে পড়ে, বছর পঁচিশ আগে বিলাতের "লেবর মন্থলি" পত্রিকায় রজনী পাম দত্ত-এর প্রত্যাশা যে মার্কস-জন্মের (১৮১৮) শতবর্ষ পরে যেমন প্রথম সোসালিস্ট বিপ্লব (১৯১৭) পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে স্থাপিত হয়েছিল, তেমনই হয়তো মার্কস-এর মৃত্যুর (১৮৮৩) একশো বৎসর যখন পূর্ণ হবে তখন দেখা যাবে জগতের অধিকাংশে তার জয় হবে। এটা অবশ্য কথার কথা, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। তেমনই বছর দশেক আগে "স্টেটস-মান" দৈনিকে Russell Warren Howe নামক সুপরিচিত সাংবাদিক মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার পরি-স্থিতি ব্যপদেশে লিখে ফেলেন যে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ সোসালিস্ট হয়ে যেতে বোধহয় দেরি হবে না! একথার ওপর বিন্দুমাত্র জোর না দিয়েই বলি যে সম্প্রতি সারা দুনিয়াতে সোসালিজম-এর প্রসার শুধু স্তব্ধ নয়, বিলম্বিত হওয়ার মতো বেশকিছু ঘটনা ঘটে চলেছে। আমাদেরই জীবদ্দশায় সোসালিজম-এর অনেক বেশি ব্যাপক অগ্রগতির স্বপ্ন যদি দেখে থাকি, তো তাকে কল্পনাবিলাস বলে মানতে বাধ্য হতে হয়েছে।

এজন্যই যদি কেউ ভাবেন যে মার্কসতত্ত্বে প্রত্যয় যাদের গভীর তারা পরাজয় স্বীকার করছেন, তা হলে সেটা হবে অন্যায়, অসঙ্গত। মার্কসবাদের "ভবিষ্যৎ" নিয়ে কেউ-কেউ চিন্তিত ভাব দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু মার্কসবাদ যে প্রত্যয় সঞ্চার করে তা সহজে শিথিল হবার নয়। মনে পড়ে যাচ্ছে, বিশের দশকে ইতালিতে ফ্যাশিজম-এর উদ্ভবকালে দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে বলেছিলেন: 'মানবমুক্তির ভবিষ্যৎ বিষয়ে যাঁরা প্রশ্ন করেন তাঁদের বলব যে শুধু ভবিষ্যৎ নয়, মুক্তির মাহাত্ম্য হল চিরন্তন' (not only a future but eternity)। "eternity" নিয়ে ক্রোচে-র মতো কিছু বলার অধিকারী কেউ নই, তাই শব্দটি নিয়ে তর্ক যেন না ওঠে। কিন্তু ক্রোচের যা বক্তব্য তা সুস্পষ্ট। মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন আমরা নই, কারণ যথাসাধ্য প্রয়াসে যে বিশ্বাসকে গ্রহণ করার স্পর্ধা আমাদের কারও-কারও, তারই জোরে বলব যে সবচেয়ে মহার্ঘ ঐতিহাসিক অর্থে মানবমুক্তির 'সাধকতম' প্রকরণরূপে মার্কসতত্ত্বের পরাজয় নেই। কাল নিরবধি, পৃথ্বী বিপুলা—অধৈর্য হব কেন, জগৎ জুড়ে বিপ্লবের আশু সাফল্য হয়তো বা স্তব্ধ হয়েছে, কঠোরতর পরীক্ষায় পড়েছে। কিন্তু সমাজবাদ-সাম্য-

বাদের ঐতিহাসিক বিজয় বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়।

* *

মাওৎসে-তুং অনেক গভীর কথা বেশ মজার সুরে বলার এক অদ্ভুত শক্তি রাখতেন—'কখনও শ্রেণী-সংঘাত ব্যাপারটাকে যেন ভুলে না যাওয়া হয়' ('Never forget the class struggle') এমনই এক উক্তি। আমাদের ভারতবর্ষে আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে ব্রহ্মার এক-"মুহূর্ত"-বিষয়ক ধারণা, যার পরিমাপ কত কোটি বৎসরে কে জানে। আমাদেরই মতো প্রাচীন দেশ বলেই হয়তো মাওৎসে-তুং বলতেন যে জগৎ জুড়ে সোসালিজম হতে কয়েক শো কেন, হয়তো কয়েক হাজার বছর লাগতে পারে। কৌতুকে সিদ্ধহস্ত মাও একবার সোভিয়েট নেতা কোসিগিনকে বলেন : 'দেখুন, চীন-সোভিয়েট ঝগড়াটা চলবে দশ হাজার বছর'—আর সঙ্গে-সঙ্গে যোগ দেন, 'তবে কমরেড কোসিগিন যুক্তি দিয়েছেন এত সুন্দরভাবে যে আমি দশ থেকে এক হাজার বাদ দিয়ে দিলাম!' এ ধরনের কথার আক্ষরিক ব্যাখ্যা বাতুলতা, কিন্তু সার কথা হল কাল যখন আদি-অন্ত-হীন, তখন কালের গতিতে সমাজরূপান্তর নিক না যতটা সময় প্রয়োজন বলে প্রমাণ হয়। কমিউনিস্ট প্রযত্নে লিপ্ত যারা তারা জানে যে বাধাবিপত্তি যতই আসুক, সমাজবাদ-সাম্যবাদের সাফল্য অবধারিত। তার স্বচ্ছন্দ গতি সম্ভব হলে তা ত্বরান্বিত হবে, পর্বতা-রোহণের মতোই মাঝে-মাঝে পশ্চাদপসরণের প্রয়োজন ঘটলেও তার অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হবার নয়। সঙ্গে-সঙ্গে জানি যে জীবনে চূড়ান্ত শৃঙ্গ বলে কিছু নেই, মানুষের সমাজের পরিবর্তনপ্রক্রিয়ায় পূর্ণ ছেদ কখনও পড়ে না, পড়তে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন এই পরিক্রমা, যা অনুধাবন করে মার্কসীয় চিন্তা আর কর্মধারা। এই বিপুল বিরাট ঐতিহাসিক পরি-প্রেক্ষিতে শ্রেণীহীন শোষণরহিত ব্যক্তি ও সমষ্টির সামঞ্জস্যসূচক অবস্থান মার্কসবাদের অম্বিষ্ট। সাময়িক সাফল্য বা অসাফল্যে বিচলিত, আশাহত, কর্মবিমুখ বাক্‌সর্বস্বতা পরিহার করে যথাবিহিত সমাজরূপান্তর-প্রয়াসে লিপ্ত হওয়াই মার্কসবাদীর কর্তব্য এবং অভীষ্ট।

* *

সোভিয়েট নেতা গর্বাচভ কিছুকাল ধরে সমাজবাদী ব্যবস্থায় বহু বিভ্রান্তি ও অপরাধের পুঞ্জীভূত ফলস্বরূপ যে গ্লানি দেখা দিয়েছে তাকে অপসৃত করার জন্য "পুনর্বিন্যাস"-এর চেষ্টায় নেমেছেন, "নবচিন্তা" প্রয়োগ করে সমাজবাদের "সম্ভাবনা'কে" ('potential') বিকশিত, পরিপুষ্ট, সুবিস্তৃত করতে চাইছেন। এমন কার্যক্রমে স্বাভাবিকভাবেই 'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ' বেরিয়ে পড়ে। আর তাই মাঝে-মাঝে আসছে এমন খবর যা আগে কল্পনাই করা যেত না। যাই হোক, সন্দেহ নেই যে সঙ্গে-সঙ্গে গর্বাচভ নিশ্চিত যে 'বিপ্লবই এগিয়ে চলেছে' আর সোসালিজমের মূল-নীতি বর্জনের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। মুশকিল মাঝে-মাঝে হয় সোভিয়েটে 'বাঁধা গোরু ছাড়া' পাবার মতো কিছু ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শোনা যায় আঁকাবাঁকা (কিংবা প্রায় নির্বোধ) কথা আর মনে পড়ে যায় : 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ!' আর না বলে উপায় নেই যে প্রকৃতই মহার্ঘ এক ধরনের প্রাঞ্জল প্রশান্তি গর্বাচভ-এর সুচিন্তিত বক্তব্যে থাকলেও তিনি কমিউ-নিজম-এর জগৎজোড়া অভিযোগের পথে (যে যাই বলুক, কমিউনিজম-এর আন্তর্জাতিক চরিত্র অকাট্য, স্বদেশপ্রেমে কমিউনিস্টরা কারও চেয়ে ন্যূন না হওয়া সত্ত্বেও) কতগুলো কণ্টক নিক্ষেপ করেছেন যা না করলেই ভালো ছিল। এর বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয় বলে কয়েকটা ইঙ্গিত মাত্র দেবার চেষ্টা করব।

সোভিয়েট ইতিহাসে কতকগুলি "অন্ধ অধ্যায়" ('blind spots') নিয়ে আলোকপাত অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু মাত্রা হারিয়ে পরিস্থিতিনিরপেক্ষ বিচারে, আজকের নিরিখে পূর্বতন পরিস্থিতিতে জীবনমরণযুদ্ধে ব্যাপৃত নেতৃত্বের আতিশয্য ও অন্যায়ের উদ্‌ঘাটনকল্পে এমন সমস্ত বাক্য বিঘোষিত হয়েছে যাতে শুধু যে সোসালিজম-এর শত্রুপক্ষ (যার অস্তিত্ব এবং কদর্য দুরবৃত্তি সংশয়াতীত) লাভবান হয়েছে তা নয়, সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র সোভিয়েট বিপ্লব এবং তার উচ্চাবচ ইতিবৃত্তের এমন অবমূল্যায়ন ঘটেছে যা তথ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নয়, তত্ত্বের দিক থেকেও ক্ষতিকর এবং বেশ কিছু পরিমাণে ভ্রমাত্মক। ছত্রিশ বৎসরেরও বেশি আগে যাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেই স্টালিনকে নিয়ে যেভাবে শুধু এক ব্যক্তির নয়—একটা সমগ্র যুগের চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা হয়েছে, সেটা কেবল বৌদ্ধিক নয়, মানবিক বিচারেও অগ্রাহ্য। স্বয়ং লেনিনকেও যে-ভাবে প্রায় একজন পরম বৈষ্ণবের মতো দেখাবার প্রয়াস ঘটেছে, যাঁর সারাজীবন ছিল অক্লান্ত অকুতোভয় বিপ্লবসাধনায় সদাপ্রদীপ্ত, তাঁর কর্ম-যোগের অল্পাংশের ওপর জোর দিয়ে ইতিহাসের এই গরিষ্ঠ বিপ্লবী সত্তাকে খণ্ডিত করা হয়েছে। তাতে দুঃখ শুধু নয়, একটু বিচলিত বোধ না করে উপায় থাকে না। মনে পড়ে যাচ্ছে, ত্রিশবৎসরাধিক পূর্বে ইন্দোনীশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েট ইতিহাস (বিশেষত স্টালিন নেতৃত্বে) পর্যালোচনান্তে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা হল—'ivory flawed but ivory still' ('হাতির দাঁতে দাগ পড়লেও সেটা হাতির দাঁত')। এশিয়ার মধ্যে চীনের পর সবচেয়ে বৃহৎ এবং বিপুলশক্তিশালী এই পার্টির উল্লেখও অধুনা শোনা যায় না। ফরাসি সোভিয়েট চীন ইত্যাদি বিপ্লবের ফলে মানুষের যন্ত্রণা যে কত বৃদ্ধি পেয়েছে, কত "সন্ত্রাস" ('terror') ঘটেছে, তাই এখনকার প্রচারে এক মুখ্য উপজীব্য। (অথচ কম লোকেরই মনে আছে যে ১৯৬৫-৬৬ নাগাদ সময়ে অন্তত পাঁচ-ছয় লক্ষ মানুষকে ইন্দোনীশিয়াতে "কমিউনিস্ট" সন্দেহে নির্মমতম গণহত্যার শিকার হতে হয়েছিল। কে-ই বা মনে রাখে আজও দুনিয়াব্যাপী ধনতন্ত্রের বহুরূপী দুঃশাসনের শিকার দেশে-দেশে অগণিত নির্জিতের কথা?) "বিপ্লবের মূল্য" নাকি এতই বিকট যে তাকে ধিক্কার দিতেই হবে—এমন ধারণা প্রায় নির্বিবাদে প্রচারিত হচ্ছে। অবশ্যই আজ মানুষ এতটা অগ্রসর যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রগতিফলে যেমন বিনা রক্তপাতে শিশুজন্ম সম্ভব, তেমনই অনুকূল অবস্থায় "রক্তাক্ত" বিপ্লব বিনাই সমাজরূপান্তরের সম্ভাবনা বাস্তব হয়েছে। মার্কস আর এঙ্গেলস এটা জানতেন বলেই প্রথম থেকে ঘোষণা করে এসেছেন যে কমিউনিজম এবং গণতন্ত্র (প্রকৃত গণতন্ত্র, শোষণভিত্তিক সমাজে পোশাকি গণতন্ত্র নয়) হল সমার্থক।

স্বীকার করতেই হবে যে, নানা কারণে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ধনতন্ত্রের অবনতি যে হারে ঘটবে বলে অনেকে ভেবেছিলাম তা দেখা যায় নি। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশ্চর্যবেগে দেখা দিয়েছে আর তার সুযোগ নিতে পেরেছে 'পশ্চিমী' বলে বর্ণিত দেশগুলি (মজা লাগে দেখে যে হিটলার যেমন ফ্যাশিস্ট বন্ধু জাপানকে "অনারারি আর্য" বলে কোল দিয়েছিল, তেমনিই 'পশ্চিম' জগৎ প্রাচ্যের জাপানকে তার যূথে বেঁধে রেখেছে, নানা সহায়তা দিয়ে আজ অবশ্য দেখছে যে প্রযুক্তিবলে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে জাপান শুধু সমকক্ষ নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীও!) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অসম্ভব শক্তিক্ষয় সামলে উঠে আর সঙ্গে-সঙ্গে আণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পাশ্চাত্যের সঙ্গে অসম পাল্লা দিতে বাধ্য হয়ে সোভিয়েটের অগ্রগমন বাধা পায় খুবই। এজন্য ১৯৬২-৬৩ নাগাদ সময়ে সোভিয়েট নায়ক খ্রুশ্চভ্ যে অহংকার প্রকাশ করেন যে পনেরো বছরের মধ্যেই আমেরিকাকে সোভিয়েট টেক্কা দিতে পারবে, তা ভেঙে যায় আর দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ দুনিয়ার আধিপত্য নিয়ে, বহুজাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এবং 'নয়া-উপনিবেশবাদ' যাকে বলা হয়, তার সহায়তা সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষে নিয়ে ধনতন্ত্র তার কর্তৃত্ব চালাতে পারছে। সোভিয়েটের মতো দেশে আবার কিছুকাল ধরে হয়তো দেখা

দিয়েছিল শৈথিল্য—বৈপ্লবিক উদ্দীপনাকে সর্বদা সজীব রাখা তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু সন্দেহ নেই একটা স্থবিরতার ভাব এসেছিল, নানাবিধ সাফল্যে আত্মসন্তুষ্টিও এই শৈথিল্যকে সাহায্য করেছিল, আর এরই ফলে ঘটেছিল কমিউনিস্ট পার্টিরই চারিত্রিক অধঃপতনের সূত্রপাত, অন্যায় আর অনাচার আর অপকর্মকে ঢেকে রাখার একটা ক্ষুদ্রচেতা প্রবণতা। এতে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়—সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দু কোটি বিশলক্ষ, চীনে চারকোটিরও বেশি। কোথাও কোনো সমাজব্যবস্থায় তো স্বর্গ থেকে দেবদূত নেমে এসে কমিউনিস্ট বা অন্য কোনো পার্টি গড়ে না, সুতরাং বিপুলসংখ্যা শুধু শক্তি নয়, সঙ্গে-সঙ্গে সমস্যা সৃষ্টি করল যার মোকাবিলা অত্যন্ত কঠিন। এসব ব্যাপার বেশ কিছুকাল ধামাচাপা ছিল বলেই গর্বাচভ-প্রমুখের দিক থেকে কঠোর কঠিন ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়েছিল। সে ব্যবস্থা সফল হোক আশা করব, কিন্তু সবিনয়েই জানাব যে এবংবিধ কারণে সমাজবাদ-সাম্যবাদই যেন ধিক্কৃত না হয়, স্নানের পর নোংরা জল ফেলতে গিয়ে শিশুকেই যেন ছুঁড়ে ফেলা না হয়।

সোসালিস্ট দেশগুলি আর 'পশ্চিমী' দুনিয়ার সম্পর্কে অনেক দিন ধরে যে বরফ জমেছিল তাকে গলাবার যে উদ্যোগ সোভিয়েটের পক্ষ থেকে নিয়েছেন গর্বাচভ এবং এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে যে-সাফল্য দেখাতে পেরেছেন, তাকে অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠা কারও নেই। সমাজবাদ-সাম্যবাদের উৎকর্ষই যে এভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তা কিন্তু অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়। সোভিয়েটরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই বিশ্বশান্তি বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে; ১৯২১-২২ সালে জেনোয়া সম্মেলনে নিঃশর্ত ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের কথা তুলে তখন সদ্যোজাত সোভিয়েট জগৎকে বিস্মিত করেছিল। আণবিক যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করলে সোভিয়েটের অস্তিত্বলোপেরই আশঙ্কা ছিল, সেজন্য সে প্রতিযোগিতায় তাকে নামতেই হয় আর সমশক্তির অধিকারী না হলে উপায়ান্তরও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারবার বিবিধ উপলক্ষে শান্তির স্বার্থে নিরস্ত্রীকরণের কথা সোভিয়েট বলেছে—সংকোচ করে নি জানাতে যুগপৎ "নাটো" এবং "ওয়ার্স-চুক্তি" যে শক্তিসমাবেশ করেছে তাকে ভেঙে দেওয়া হোক, পরস্পরকে টেক্কা দেওয়া বন্ধ হোক, আর শুধু পারমাণবিক অস্ত্র নয়, মামুলি অন্যান্য 'conventional' অস্ত্রসংকোচন ও নিরস্ত্রীকরণ ঘটতে থাকুক। 'পশ্চিমী', অর্থাৎ মূলত মার্কিন দিক থেকে সাড়া মেলে নি, বরং এ ধরনের প্রস্তাব প্রবঞ্চনামূলক বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও নিরলস শান্তিপ্রচেষ্টা সোভিয়েট চালিয়ে এসেছে। যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাণ আর বিধ্বংসশক্তি আজ এমন যে যুদ্ধ বাধলে (আর অনিবার্যভাবে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লে) মানুষ আর তার এতকালকার সভ্যতারও বিলুপ্তি ঘটবে বলেই, শান্তি ব্যাপারে সমাজবাদ-সাম্যবাদের এই একান্ত আগ্রহ। ১৮৬৪ সালে মার্কস বলেছিলেন যে মেহনতি মানুষ দেশে-দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সর্বত্র পতাকায় উৎকীর্ণ হবে "শ্রম" আর "শান্তি"। এদিক থেকে গর্বাচভ যে সাফল্য পেয়েছেন তার তারিফ কে না করবে? এজন্যই তিনি বিশেষ করে জোর দিয়েছেন ইয়োরোপের উপর, কারণ সেখানেই রয়েছে যুদ্ধ-আয়োজনের গভীরতম অবস্থান আর আধুনিক যুগে যুদ্ধের আগুন জগৎকে পুড়িয়েছে ইয়োরোপ থেকেই শুরু করে। এজন্যই পশ্চিম জার্মানির মতো এলাকা যেখানে কয়েক লক্ষ মার্কিন সৈন্য এবং অতিবিধ্বংসী যুদ্ধের সরনজাম বিকটভাবে মজুদ সেখানকার মানুষের মন থেকে সোভিয়েটের অভিপ্রায় বিষয়ে সন্দেহ দূরীভূত করে আর ইয়োরোপের সব দেশেই সোভিয়েট বৈরিতা দূর করার চেষ্টায় তিনি নেমেছেন। ইতিমধ্যে বরফ কিছুটা গলেছে। যে-মার্কিন নেতারা সেদিন পর্যন্ত সোভিয়েট দেশকে জাতশত্রু ভেবেছে, "অমঙ্গলের সাম্রাজ্য" বলে চিৎকার করেছে, তারাই আজ যুদ্ধাস্ত্রসংবরণ বিষয়ে আলোচনায় বসছে, আংশিক হলেও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করছে, মোটামুটি স্বাভাবিক পরস্পর সম্পর্ক রেখে চলতে চাইছে। এখনও অবশ্য চার বছরে ১'৬ বিলিয়ন ডলার খরচের কিংবা "তারকাযুদ্ধ"-র পরিকল্পনা ছাড়ে নি, নানা দেশে ছদ্মবেশে কর্তৃত্ব ("surrogate colonialism") পরিহারের লক্ষণ দেখায় নি, কিন্তু অন্তত সর্বনাশী যুদ্ধের আতঙ্ক কতকটা প্রশমিত হয়েছে। এটা যে ঘটেছে প্রধানত সোভিয়েটের উদ্যোগে, তা মনে রাখার মতো ব্যাপার।

যত্র-তত্র এবং যখন-তখন সোসালিজমের গুণগানে সুফলের সম্ভাবনা হয়তো কমে বই বাড়ে না। কিন্তু এই সুবাদে বলতে চাই যে, যুদ্ধ বর্জন করে সমাজের সঙ্গতি মানবকল্যাণে প্রয়োগের ক্ষমতা ধনতন্ত্রে নেই বলেই সোসালিজম-এর প্রকৃত উৎকর্ষ। আজ নাকি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বিভিন্ন বিচিত্র বিভাগে যে দক্ষ শিক্ষিত শ্রমশক্তি নিযুক্ত, তার প্রায় অর্ধেক যুদ্ধায়োজন কিংবা তার সম্পর্কিত ব্যাপারে লিপ্ত। মার্কিনদেশে স্বয়ং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার যে 'মিলটারি ইনডস্ট্রিয়ল কমপ্লেক্স'-এর কথা বলতেন, তার সূত্র এইখানে। আজ জগৎ জুড়ে প্রচণ্ড শক্তিধর "বহুজাতিক" শিল্পসংস্থানের সঙ্গে এই যুদ্ধায়োজনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই পারস্যোপসাগরে হোক কিংবা যে-কোনো বহুদূরাবস্থিত অঞ্চল হোক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "নিরাপত্তা"-র জন্যই সেখানে মার্কিন কর্তৃত্ব স্থাপন ও চালনা অপরিহার্য বলে নির্লজ্জ ঘোষণা শোনা যায় (অথচ প্রতিবেশী আফগানিস্তান মৈত্রীচুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েটের সহায়তা পেলে সেটা হয় "অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ"।) এজন্যই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিকারাগুয়া, যেদিকেই তাকানো যাক না কেন, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো ধ্বজাধারী মার্কিন শক্তির দাপাদাপি জগৎ জুড়ে অবলীলাক্রমেই চলে এসেছে। বাক্যব্যয় থাক—যা বলতে চাই তা হল যে ধনতন্ত্রের অর্থনীতি এমনভাবে যুদ্ধায়োজনের সঙ্গে জড়িত যে যুদ্ধ ব্যাপারটাই বন্ধ হলে সে অর্থনীতির কাঠামো খাড়া রাখা একান্ত দুরূহ। ১৭-১৮ বছর আগে আমেরিকায় প্রকাশিত "Report from the Iron Mountain"-ধরনের গবেষণাগ্রন্থে দেখেছিলাম যে যুদ্ধের অবসান হলে ধনতন্ত্রের বিপদ হবে চূড়ান্ত। এ-দিক থেকে সোসালিজম নিস্তার পাবার ক্ষমতা রাখে। বাস্তবিকই তাই আন্তরিকভাবে যুদ্ধকেই বাতিল করার কথা সোসালিজম বলতে পারে। ধনতন্ত্র পারে না। এ-নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমার পক্ষে সমীচীনও নয়। কিন্তু সোসালিজম-কমিউনিজম ব্যর্থ হয়ে গেছে, বিপ্লবের আজ বারোটা বেজে গেছে, জগৎ জুড়ে বুর্জোয়া "গণতন্ত্র"-এর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়ছে—এসব কথা এত বেশি শোনা যাচ্ছে যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম।

* *

পোলানড বা হাঙ্গেরির মতো দেশে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ না করে পারছি না। বাস্তবিকই রীতিমতো দুশ্চিন্তার কথা যদি বহু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, বহু সমুজ্জ্বল সংগ্রামে অর্জিত সোসালিস্ট ব্যবস্থার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা তাদের ঠেলে দেয় সোসালিজম-বিরোধিতার পথে। এখনও মনে হয় না তেমন বিপদ আসন্ন, যদিও তার সম্ভাবনাও বিচলিত করবে বই কি। দুটো দেশেই একাধিকবার গিয়েছি, হাঙ্গেরি বিষয়ে একটি মাঝারি আকারের গ্রন্থও লিখেছি। সেখানকার মানুষ যদি আজ সোসালিজম প্রত্যাখ্যান করে তো নাচার। কিন্তু মনে করি না তা ঘটতে চলেছে। অবশ্য পোলানডে যখন দেখি যে লখ ভালেজা (যাকে বছর আষ্টেক আগে লনডন "টাইমস"-এ দু-পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণে নামকরা টীকাকার বর্ণনা করেন 'the fuse under the Kremlin' বলে) তাঁর নিজস্ব বন্দর-শহর Gdansk-এ মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ-সাহেবের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনুচরসমাবেশকে জোড়া আঙুল তুলে বিজয়-সংকেত দেখাচ্ছেন, তখন মনে হয় এ বুঝি অমৃতসরে খলিস্তানি জগজিৎ সিং চৌহান

আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার-এর একত্র দাঁড়িয়ে ভারতসরকারকে তুড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো! অবশ্য পোলানডে কয়েকটা কঠোর সমস্যা অনেক দিন থেকে জমে উঠেছিল। হিটলারি বীভৎসতার স্মৃতি পোলদের মন থেকে কখনও মুছে যাবার নয়। কিন্তু জার-সাম্রাজ্যে বহুকাল অবস্থিতির ফলে রুশদের সম্বন্ধে তাদের একপ্রকার অনীহা দূর হতে সময় লাগে। তা ছাড়া সেখানে ক্যাথলিক চর্চ-এর প্রবল প্রতাপ (যা পোলানডের সন্তান ইতিহাসে। এই প্রথম "পোপ" হবার ফলে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, পোপ স্বয়ং তাতে সহায় হয়েছেন) যা আমরা যাকে "মৌলবাদ" বলে থাকি, তারই এক কিছু পরিমাণে মার্জিত হলেও শক্তিশালী প্রকাশ এবং নিয়ত কমিউনিজমের সংহার-সংকল্পে নিযুক্ত। সন্দেহ নেই যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই পরিস্থিতিকে অনেকাংশে বদলাতে পেরেছে, কিন্তু পোলানডের মতো দেশে সমাজবাদ-সাম্যবাদও এর মোকাবিলা শেষ করতে পারে নি। তাছাড়া আরো নানা কারণে—এবং মূলত মনে হয় বৈপ্লবিক উদ্দীপনা শুধু নয়, বৈপ্লবিক কর্ম-ব্যাপৃতি আর কর্তব্যপরায়ণতায় ঢিলেমি এসে পড়ার ফলে—বেশ কিছু বিকট সমস্যা হাজির হয়েছে আর সাধারণ মানুষ অনেকটা দিশাহারা বোধ করছে। বহুগুণান্বিত যে-দেশের মানুষ সেই পোলানডেরই দুর্নাম হল যে তারা বিবাদপরায়ণ—প্রবাদবাক্য রয়েছে: 'একজন পোল? সে গুণধর একটা চরিত্র-বিশেষ; দুজন পোল? এই রে, ঝগড়া বেধে গেছে; তিনজন পোল? আহ, এই তো পোলিশ সমস্যা!' পাঠকরা নিজগুণে মার্জনা করবেন, কিন্তু এই প্রবাদের কথা লিখতে গিয়ে আমাদের বাঙালি স্বভাবের কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য যেন দেখি।

ইতিহাস তো চলতে থাকবে। তাই আশা হারাচ্ছি না পোলানড বা হাঙ্গেরি বিষয়ে। শুধু চাই গর্বাচভ-সমেত সবাই যেন সতর্ক হন যে আজ সমাজবাদ-সাম্যবাদী চিন্তা ও কর্মে "ইয়োরোপকেন্দ্রিকতা"র দিকে যে ঝোঁক, তাকে সংযত না করলে সকলের ক্ষতি। দুঃখ হয় দেখে যে জানোস কাদার-এর (১৯১২-৮৮) মতো প্রাজ্ঞ নেতৃত্বকেও অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে—দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধকালে মার্কিন দেশে আর্ল ব্রাউডর কমিউনিস্ট পার্টি বিলোপের প্রস্তাব কিছু-কাল চালু করতে পেরেছিলেন, কিন্তু সেদেশের কমিউনিস্টরাই তা মানে নি। মনে পড়ছে বছর দশেক আগে কাদার বুদাপেস্তে পার্টি কংগ্রেসে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকভরে বলেছিলেন: 'ইতিহাসে প্রথম পার্টিনির্দেশ বোধ হয় হল তিন হাজার বছরেরও বেশি পুরানো Ten Commandments—এখনও তা ঠিক অনুসৃত হয় নি মানবজীবনে, তবে আমরা আশা করব যে কমিউনিস্টরা একটু জোরেই এগোতে পারব!' পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাঙ্গেরি বেশকিছু সাহসিক পদক্ষেপ নিয়ে সবাইকে উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু সন্দেহ নেই যে আজ সে-দেশে পার্টির পূর্বতন জনসমর্থনে রীতিমতো ঘাটতি পড়েছে। তাই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন প্রভৃতির নামোল্লেখ না হোক, সমাজবাদ-সাম্যবাদকেই যেন শিকেয় তুলে "গণতান্ত্রিক, ইয়োরোপীয়" (যা-ই এর অর্থ হোক) আদর্শের কথা প্রচার হচ্ছে। ইয়োরোপ নিয়ে গর্বে কারও আপত্তি নেই, থাকার অধিকারও নেই, কিন্তু যে-হাঙ্গেরি ১৯১৯ সালে মার্কসবাদী বিপ্লব ঘটায়, চরম নিষ্পীড়নের ফলে যার বিনাশ ঘটে, যে-হাঙ্গেরি কমিউনিস্ট শাসনের অধঃপতন লক্ষ করে তাকে যথাযথ সম্মার্জনকর্মে সার্থকতা দেখিয়েছে ত্রিশবৎসরাধিককাল, সেখানে 'ইয়োরোপ'-এর নাম করে সাম্যবাদ বর্জনের মতো 'মাতভ্রংশ' অচিরে সংশোধিত হবে ভরসা করছি।

কথা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনে আসছে ৭ই অকটোবর ১৮৫৮ সালে কার্ল মার্কস-এর চিঠি এঙ্গেলসকে। গোটা দুনিয়া নিয়ে ছিল তাঁদের চিন্তা আর তাই দেখি মার্কস বলছেন বিপ্লব যদি পাশ্চাত্যের কোনো "ক্ষুদ্র প্রান্তে" ('tiny little corner') অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা ধনতন্ত্রের কবজায় থাকে তাহলে সে-বিপ্লব তো 'একেবারে নিষ্পিষ্ট' হয়ে যাবে। এজন্যই তখন মার্কস ব্যস্ত ছিলেন শুধু আয়রলানড নয়, চীন, ভারত, মিশর, আলজীরিয়া প্রভৃতির ইতিহাস নিয়ে। ইয়োরোপ-কেন্দ্রিকতা মার্কসবাদের ধাতে সহ্য হয় না বলেই বুঝি কিছুকাল পূর্বে বহুপ্রচারিত "ইউরো-কমিউনিজম" (কেউ-কেউ বললেন "ইউরো-সোশালিজম") বাজার জমাতে পারে নি। এখন রব উঠেছে "ইয়োরোপ" "গণতন্ত্র" আর "ইয়োরোপীয়" কায়দায় সমাজবাদ নিয়ে। ১৯১৭ সাল থেকে সাম্যবাদের যে ইতিহাস তাতে ভুলভ্রান্তি অপরাধ অনাচার অত্যাচার ইত্যাদি অবশ্যই আছে কিন্তু 'peccavi' ('পাপ করেছি') বলে বেড়াবার দুরবস্থা কেন হবে? আত্মসমালোচনার নামে আত্মনিন্দা সোভিয়েট দেশে সম্প্রতি এমনভাবে হয়েছে যে মনে পড়ে যায় বছর দশেক আগে প্রকাশিত এক বইয়ের কথা: "Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba, 1928-78" By Paul Hollander (Oxford University Press, 524 pp.) যার প্রধান প্রতিপাদ্য হল যে আতিথেয়তার প্রাচুর্যে বহু জগদ্বিখ্যাত মনস্বীর সুখ্যাতি পেয়েছে এসব দেশ! রবীন্দ্রনাথ থেকে বার্নার্ড শ। থাক্, তালিকা বাড়িয়ে দরকার নেই কারণ আদি অন্ত খুঁজে পাওয়া ভার হবে—কিন্তু কারও কাছে তো অজানা নয় যে সমাজের ইতিহাসে "ধীর বিবর্তনের অনিবার্যতা" নীতির ("inevitability of gradualness") প্রবক্তা সিড্‌নি ওয়েব এবং ব্রীট্রিস্ ওয়েব-এর মতো গবেষকশিরোমণি গভীর অভিনিবেশ করে সোভিয়েটদেশে "নব সভ্যতা" দেখে উৎফুল্ল হন আর ১৯৪১ সালে এ বিষয়ে তাঁদের মহাগ্রন্থে ঘোষণা করেন যে 'জগতের সবচেয়ে সর্বব্যাপী ও সমানাধিকার ভিত্তিক গণতন্ত্র' সেখানে স্থাপিত হয়েছে। বিলাতের বিখ্যাত ধর্মযাজক হিউলেট জনসন বলতে পেরেছিলেন যে মানুষে-মানুষে ভালোবাসা সোভিয়েট ব্যবস্থায় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'লিবারল' মনস্বী এডমনড উইলসন স্টালিনের কর্তৃত্ব যখন তুঙ্গে, তখনই মস্কো সম্বন্ধে বলেন যে 'এদেশে এলে ভাবি যেন পৃথিবীর নৈতিক গিরিশৃঙ্গে অবস্থান করছি!' রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় না-ই বললাম। কিন্তু এ ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া যে সমাজ বিষয়ে জানা গিয়েছে, তাকে সর্ব অবস্থায় বেদবাক্য মনে না করেও অন্তত মর্যাদা দেওয়া হবে না? অতি সম্প্রতিও দেখা যায় যে সমাজবাদের ছিদ্রান্বেষণই যে-পণ্ডিতদের ব্রত, 'Sovietologist' বলে যাঁদের পরিচয় পশ্চিমজগতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা বিরাজ-মান, তাঁরাই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সম্ভবত প্রকাশিত পত্রিকায় লিখছেন সোভিয়েটের শক্তি সম্বন্ধে যে সেখানকার মানুষ 'দৈর্ঘ্যে দশ ফুট না হলেও আট ফুট তো বটেই' আর 'পশ্চিম'-কে তৈরি হতে হবে তদনুযায়ী। দরকার নেই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার, কিন্তু সোশালিস্ট দেশগুলির অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় অর্জিত কৃতিত্বকে একেবারে ছোটো করে দেখার বর্তমান ঝোঁক শুধু ভ্রান্ত নয়, সঙ্গে-সঙ্গে বিপজ্জনক। সোভিয়েট, চীন, কিউবা প্রভৃতি দেশকে শুধু যে সমাজবাদের নিছক বৈরীদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে তা নয়, সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে হয়েছে কটু সমালোচনা বহু 'বন্ধু'-মহল থেকেও—যাদের 'যুক্তি' হল যে সোসালিজম যেহেতু নিখুঁত আর সোশালিস্ট দেশ-গুলি যখন নিখুঁত নয়, তখন সেটা প্রকৃত সোসালিজমই নয়!

এহেন ধারণা নিয়ে "New Left" ইত্যাদি বহু ধারার অস্তিত্ব চলে এসেছে আর তারই এক প্রাক্তন প্রতিনিধি হলেন রেজি দ্য ব্রে, যিনি কিছুকাল নাম করেছিলেন অবিস্মরণীয় বিপ্লবী চে গুয়েভারা'র সঙ্গ নিয়ে আর বর্তমানে ফ্রান্সের সোশালিস্ট রাষ্ট্রপতি মিত্তের-মহোদয়ের সহকারী হয়ে বিরাজ করছেন। ইনি প্যারিসে গর্বাচভকে প্রশ্ন করেন সোভিয়েট "ইয়োরো-এশিয়ান" রাষ্ট্র কি না। জবাব দেন নি

গর্বাচভ, যদিও সোভিয়েট রাষ্ট্রের ১৫টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আটটি এশিয়ায় অবস্থিত। যাই হোক, বিশ্ব-শান্তিপ্রয়াসব্যপদেশে শুধু ইয়োরোপের উপর জোর দেওয়াই আপাতত সোভিয়েট নেতৃত্বের উদ্দেশ্য। একারণে আমার মনে কিছু উৎকণ্ঠা আসে। সে-উৎকণ্ঠা বাড়ে যখন দেখি সোভিয়েট বিদেশমন্ত্রী স্বয়ং বুঝি বলেছেন যে আফগানিস্তানের বিপ্লবকে (১৯৭৯) সাহায্য দিতে গিয়ে সোভিয়েট ভুল করেছে। মার্কস-এর নামোল্লেখ বেশি না করলেও গর্বাচভ অন্তত লেনিনকে স্মরণ করেন সর্বদা। ভরসা করি কেউ ভুলবেন না লেনিনের নির্দেশ যে সোশালিস্ট বিপ্লব কিছুতেই সর্ববিধ উপায়ে সারা দুনিয়ায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জায়মান সমাজবিপ্লবের সহায় হবার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত না হয়। ইয়োরোপ নিয়ে আগ্রহাতিশয্য যেন এশিয়া-আফ্রিকা-দক্ষিণ আমেরিকার চলমান সংগ্রামকে উপেক্ষা না করে।

ইয়োরোপে 'সোশাল ডেমোক্রেসি' বলে অভিহিত শক্তির সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মৈত্রীর মতো শুভ সংঘটন অল্পই আছে—হাঙ্গেরিতে হয়তো এরই আভাস। কিন্তু মাত্রা হারিয়ে ফেলার মতো বিপর্যয় যেন না ঘটে। সন্দেহ নেই যে কমিউনিস্ট পক্ষ থেকে অবিমৃষ্যতার বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে সোশাল-ডেমোক্রেসিকে সহজে রেহাই দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯১৭-১৯-এ সোভিয়েট বিপ্লব মুখ চেয়েছিল জার্মান ও অন্যান্য পশ্চিমী সোশালিস্টদের দিকে, কিন্তু প্রকৃত সাড়া মেলে নি। সোভিয়েট-বিরোধিতায় প্রখর হওয়ার শাস্তি মিলল যখন Weimar সংবিধান অনুযায়ী (১৯১৮) "জগতের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা" স্থাপনের গর্বে উদ্ধত জার্মান সোশাল ডেমোক্রেসি প্রায় যেন স্বেচ্ছায় পরাস্ত হল, হিটলারি ফ্যাশিজম-এর মতো নোংরা ঐতিহাসিক শক্তি বিশ্বের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করতে পারল। এ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বাড়াতে চাই না, কিন্তু সহজে ভুলবার নয় এ ঘটনা। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ফ্রান্স, ইতালি, সম্প্রতি স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি বহুদেশে বহুদিন ধরে সোসাল-ডেমোক্রেসির প্রভাব (এবং প্রায়ই সঙ্গে-সঙ্গে শাসনকর্তৃত্ব) চলে এসেছে, কিন্তু বিশ্বের সামগ্রিক চরিত্র সমসুযোগ-ভিত্তিক সমাজের অনুকূল করে তোলার কাজে তাদের অবদান কতটুকু? মিত্তের' বলতে কসুর করেন নি যে 'বিপ্লব শুধু অসম্ভব নয়, সেটা অকাম্যও', আর তদনুযায়ী কাজও করে চলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকীব্যপদেশে যা প্রকট হয়েছিল সাত প্রধান পাশ্চাত্য (জাপান-সহ) দেশের বিশ্বকর্তৃত্বপরিকল্পনায়। হাঙ্গেরি-পোলানডের ঘটনা আর সোভিয়েট নীতির সুবিবেচনা মিলে যদি সোসাল-ডেমোক্রেসির সঙ্গে কমিউনিস্ট শক্তির সম্মিলন (যা হল জার্মান গণতান্ত্রিক লোকরাজ্যে সোসালিস্ট ইউনিটি পার্টিতে প্রকট) দেখাতে পারে তো আনন্দেরই কথা। কিন্তু প্রকৃত বৈপ্লবিক বুদ্ধিমত্তা দাবি করে যে সতর্কতা, তার লক্ষণ এখনও স্পষ্ট নয়। আশার কথাই ভাবতে চাই, কিন্তু এই মুহূর্তে কিঞ্চিৎ আশঙ্কাও যেন ক্লিষ্ট করছে। সাময়িকভাবে ইয়োরোপ-চিন্তা বাড়লে ক্ষতি নেই, কিন্তু ইয়োরোপ-কেন্দ্রিকতার বিপদকে রোধ করতেই হবে। যে দুনিয়াতে আণবিক বোমা পড়ে জাপানে, কীটবিষ ছড়ানো হয় কোরিয়াতে, রাসায়নিক লড়াই ঘটে ভিয়েৎনামে—লক্ষ করার বিষয় যে সবই এশিয়াতে!—সে দুনিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও আমরা এই তথাকথিত "তৃতীয় বিশ্বে" যথেষ্ট সতর্ক আর সচেতন নই। যদি হতাম তো দেখা যেত বিস্তৃত গণ-আন্দোলন—যার অনুপস্থিতি আমাদের রাজনীতিকে কেমন যেন নির্বীর্য কলুষিত দুর্দশায় রেখে দিয়েছে।

* *

ভয় হচ্ছে যে প্রসঙ্গবাহুল্যে কণ্ঠকিত হল এই রচনা। তাই শেষ করি আর-একটি কথা বলে। সোভিয়েট ও অন্যান্য সোসালিস্ট দেশে নানা কারণে বৈপ্লবিক উদ্দীপনা সঙ্গত ঐতিহাসিক কারণেই আজ এমন স্তরে নেই যেখানে দৈনন্দিন জীবনের মান নিয়ে চিন্তা ছেড়ে দুনিয়াজোড়া বিপ্লবের কথা দেশবাসী ভাবতে থাকবে। মনে পড়ছে, মাঝে-মাঝে সেদেশে শুনেছি অভিযোগ যে কিউবা-ভিয়েৎনাম-আঙ্গোলা-আ ফ গা নি স্তা ন ইত্যাদি বাবদে সোভিয়েটের প্রচুর সম্পদ ব্যয়িত হচ্ছে যা দেশেরই অভ্যন্তরে জীবনের মান উন্নয়নে লাগালে ভালো হত। এটা স্বাভাবিক, কিন্তু এখানেই সমাজবাদ-সাম্যবাদী আদর্শনিষ্ঠার প্রকৃত পরীক্ষা। সোভিয়েট দেশ যে বিশ্বজনের প্রিয় হতে পেরেছে তা সোভিয়েটের সমৃদ্ধির জন্য নয়, সেখানে শোষণ-মুক্ত সমসুযোগের সমাজ যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠার কাজ চলেছে বলে। "লোভ" বলে যে রিপু সমাজদেহে "মৃত্যুশেল"রূপে রয়েছে, তাকে উৎপাটিত করার অসমসাহস প্রয়াসে লিপ্ত বলেই তো রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে তখনকার নিঃস্ব সোভিয়েট জীবনে তিনি "কল্যাণী"র ছবি দেখেছিলেন, সেখান থেকে প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকাতে "কুবের"-এর অবয়ব তাঁর চোখ আর মনকে পীড়া দিয়েছিল। মার্কসবাদ কখনও বলবে না সমৃদ্ধি চাই না, বলবে না মানুষ কৌপীন পরেই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবুক। কিন্তু মার্কসবাদ নিছক কৃচ্ছ্র সাধন না চাইলেও চায় সৎ, সহজ, স্বচ্ছ, সভ্য, সুশীল জীবনযাত্রা।

সেদিন দেখলাম কাগজে যে বরিস্ ইয়েলৎসিন নামে এক জনপ্রিয় সোভিয়েট নেতা (যিনি সংসদে 'বিরোধী' দল গঠনে ব্যস্ত) আমেরিকা ভ্রমণ করে সেখানকার বিপুল বিভাগীয় বিপণিতে প্রাচুর্যের পরাকাষ্ঠা দেখে স্বদেশবাসীকে তাদের দারিদ্র্য যে কত কটু, তা বোঝাতে চেয়েছেন। হঠাৎ বলা একটা কথা নিয়ে মাতামাতি হাস্যকর, কিন্তু একটু হাসি পাচ্ছে ভেবে যে বিলাতে Marks and Spencer নামে প্রকাণ্ড এক দোকান আছে, যা নিয়ে সেদেশে অনেকে কৌতুক করে বলে যে Marx and Engels-এর চেয়ে এই Marks and Spencer-ই ইতিহাসের শিক্ষা দিচ্ছে, ধনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করছে। যাই হোক, অন্তত আমাদের এই ভারতবর্ষ থেকে আজকের সোসালিস্ট দেশগুলিকে কি আমরা মনে করিয়ে দেব না যে এদেশেরই মতো পাশ্চাত্যের বহু মহামতি সম্ভোগসর্বস্ব মানসিকতা বর্জনের বাণী প্রচার করেছেন? রুশো-র কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু স্বয়ং মার্কস কি বলেন নি যে চাহিদাকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে দেওয়া একটা অপরাধ—বলেন নি কি যে 'ধনতন্ত্র অমানবিক, বাহুল্যবিশিষ্ট, অস্বাভাবিক ও কল্পনাপুষ্ট ভোগতৃষ্ণা সৃষ্টি করে আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি জানে না কেমন করে প্রয়োজনকে প্রকৃত মানবিক চেহারা দেওয়া যায়'? লোভকণ্টকিত, নিয়তপ্রতিযোগিতা-প্ররোচিত জীবনে আসে অতিরিক্ত আসক্তির সঙ্গে সম্ভোগস্পৃহার বাহুল্য, যা মানুষকে স্বস্তি ছেড়ে "সুখ"-এর সন্ধানে ছোটায়, নিয়ে যায় মাদক-আসক্তির বিষজালে, মনুষ্যজীবনকে নিরর্থক স্বার্থমগ্ন ক্লৈব্যে ডুবিয়ে দেয়। লেনিন বুঝতেন একথা আর তাই প্রচার করতেন "কমিউনিস্ট এথিক্স্," ধিক্কার দিতেন বিপ্লবোত্তর তারুণ্যের বাঁধনহীন উদ্দামতাকে। পূর্বসূরীদের মধ্যে আন্দ্রোপভ-এর এ-বিষয়ে কিছু মূল্যবান উক্তি গর্বাচভ স্মরণ করে উদ্যোগী হলে বোধ হয় মঙ্গল। সমাজকল্যাণে প্রযোজ্য নীতিকথাকে উপেক্ষা করব কেন? মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষায় প্রোথিত যে সুনীতি, তা তো মানুষের চিত্ত জয় করে একটা বিরাট বাস্তব শক্তিরূপে সমাজজীবনে সংস্থিত হবে।

দ্বীপচিহ্ন

কিরণশঙ্কর মৈত্র

তিন দশক প্রবাসজীবন
দ্বীপচিহ্ন মুছে যায়   মুখের রেখা।

ফিরে এলে রঙমশাল জ্বলে ওঠে
উদ্ভাসিত অচেনা জনপদ
বেজে ওঠে মৃদঙ্গ-মন্দিরা।

ঢেউ ঢেউ ঢেউ
ঢেউ ওঠে   ঢেউ ভাঙে
বুকের ভিতরে কত সুপ্রভ বেলোয়ারি ঝাড়
                    ভেঙে খানখান।

আলোঝলমল জাহাজে পিকনিক
পুরনো রেকর্ডে গান—
                    আপ্লুত কৌমুদী;
ভোঁ বাজে   নোঙর ওঠে
দ্বীপচিহ্ন মুছে যায়   মুখের রেখা।

চিহ্নিত তিনি

রেজাউদ্দিন স্টালিন

চিহ্নিত তিনি অপ্রতিরোধ্যভাবে,
অস্তিত্বের অগণিত কুঠরিতে—
তাঁর রক্তের কণিকারা ঝলকাবে;
আর কিছু নয় শুধু প্রতিশোধ নিতে।

যত কাফে আর কবরখানার পাশ,
যত মন্দির গির্জা ও মসজিদে—
বসানো হয়েছে সশস্ত্র সন্ত্রাস;
যেমন দেখেছি লোরকার মাদ্রিদে।

তাঁকে খোঁজা হল কৃষকের মজলিশে,
গমখেত আর নৌকার মাস্তুলে,
তাঁকে খোঁজা হল সোনামুখী ধানশীষে—
মুদিদোকানির বিষণ্ণ ঝাঁপ খুলে।

লোকগাথা সেই গীতিকা নিসর্গের
ভেতরে হয়তো লুকিয়ে রয়েছে; আর—
ষাঁড়ের লড়াই উৎসব-ব্যসনের,
খুলে দেখা হল সবকটি শবাধার।

তাঁকে পাওয়া গেল জনসমুদ্রে একা,
খুন করা হল ক্রুশকাঠে কম্পিত।
শেষবার তাঁকে তবু গিয়েছিল দেখা,
রক্তের রথে প্রতিশোধে অঙ্কিত।

বাংলাদেশ

চিত্রশালা

সুজন হাজারী

আহ! যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদের বাজখাই আওয়াজ
হুমড়ি খেয়ে ইথারে ভাসতে-ভাসতে কানে এল,
তড়িঘড়ি উঠে দরজা খুলতেই ক্যাচর ক্যাচর ক্যাচ
শব্দ হল জোরে-শোরেই—
পড়ি কি মরি শশব্যস্ততায় ছুটে বেরুলাম রাস্তায়,
সাড়া পেয়ে একটা থেঁকি কুকুর ঘেউঘেউ চিৎকারে
পাড়াটা মাথায় তুলে দে ছুট অন্ধকারে!
সহসা কে এসে দাঁড়ালে, নিশ্চুপ দেবযানী
আড়ালে-আড়ালে, এক মানুষের ছায়ার নীচে সঙ্গিহীন।
থেমে গেল আর্তনাদ!
যন্ত্রণা মিশে যায় জনারণ্যে, নিমেষের কর্পূর
কারু হাড়ে লাগে না বাতাস।
অশরীরী মানবীর মোহনীয় হাতের ছোঁয়ায়
মৃদুহেসে ঈশ্বর: খুলে দেন নিখিলের বন্ধ কবাট
অজান্তে কার যেন হাত ধরে, ঘরে এসে উঠি
ছায়াসঙ্গী যিশুর সন্তান,
সেই থেকে একই ঘরে ওঠাবসা
বসবাস, ফসকানো গেরোয় মেলবন্ধন।
তারপরেই আঁটসাট, রুদ্ধশ্বাসের একটানা উদ্বেগ,
—উচ্ছ্বাস
ঘনিষ্ঠ বাহুর পেরেকে গেঁথে নিই নিজেকেই
একাত্মতায় নারকীয় ভুবনের নাটশালে
প্রেম-বিরহের অভিনয়ে ডুবে থাকি আমগ্ন,
ভালোবাসার কঠিন হাতুড়ি ঠুকে-ঠুকে
নিরলস পরিশ্রমে, মানুষের বাঁচার স্বপ্নে,
নিখুঁত নকশা কাটি শিল্পের চিত্রশালায় সারাবেলা।

বাংলাদেশ

অতৃপ্তি

সৈয়দ সমিতুল আলম

শুকনো খড় মুখের মধ্যে নিয়ে
ঘুমিয়ে আছ ঘুমিয়ে আছ তুমি
মুখের মধ্যে অস্ফুট কোন্ কথা
ঘুমিয়ে আছ ঘুমিয়ে আছ তুমি

বেঁচে ওঠার অর্থে যখন ছিলে
শরীর চিরে শিল্পে পেয়েছিলে
কাফ্‌কা, সার্ত্র, কামুর অবিশ্বাস

অতৃপ্ত গাছ! মাটিতে আছ গেঁথে
ফুলে, পাতায় লক্ষ কোটি ঘুণ
আঁশের নীচে দ্বন্দ্ব এঁকে শুধু
ছড়িয়ে গেলে অস্থিরতার বীজ

লেখার টেবিল, কাগজ, কলম ছিন্ন
ইজেল, তুলি দুমড়ে রেখে দূরে
তুললে হাজার তৃপ্তিহীন ঢেউ

শুকনো খড় মুখের মধ্যে নিয়ে
ঘুমিয়ে আছ ঘুমিয়ে আছ তুমি
বুকের মধ্যে তৃষ্ণা জাগ্রত
বর্ণহীন ঘুমিয়ে আছ তুমি

প্রবোধচন্দ্র সেন এবং বাঙলা ছন্দ

সুধীর সেন

সূচনা

বড়দা কখন বাঙলা ছন্দ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন আমি ঠিক বলতে পারি নে। তাঁকে কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি। তবে আমার ধারণা, স্কুলের শেষের দিকেই তিনি ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হন তাঁর বিপ্লবজীবনের দিনে, প্রধানত স্বদেশী সঙ্গীতে আর দেশাত্মবোধক কবিতার কল্যাণে। সে যুগে তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল রবীন্দ্রনাথের—

* আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে।

* সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে।

* ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তিনটি কবিতা-গানও তাঁর কাছে বহুবার শুনেছি—

* ধনধান্যপুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।

* বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর
রুক্ষ কেশ?

* ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব
মেলিল নেত্র,
জ্ঞানগরিমায় ধন্য, অয়ি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।

এই দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই রয়েছে তিনটি ছন্দ—অক্ষর, -মাত্রা ও স্বরবৃত্ত, যদিও মাত্রাবৃত্তেরই প্রাধান্য বেশি। এই নামকরণ নিশ্চয়ই আরো অনেক পরে হয়েছে। খুব সম্ভব যখন রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অন্তরীণ ছিলেন, সে সময় অন্তত আপন মনে ছন্দ নিয়ে কিছু কাজ শুরু করেছিলেন। স্বদেশী সঙ্গীত যে সেই একক জীবনে দুর্বিষহ নিঃসঙ্গতার দিনে তাঁর বিশেষ অবলম্বন ছিল, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে অন্তত আরো দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা উচিত, কারণ দুইটিই ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়—

* জনগণমন-অধিনায়ক, জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

* দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

এই দুটি কবিতারই বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙলায় লেখা হলেও দীর্ঘস্বরগুলোর মূল্য দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত প্রথা অনুযায়ী, অর্থাৎ টেনে তাদের দ্বিমাত্রিক করা হয়েছে।

ছন্দচর্চা

"ছন্দজিজ্ঞাসা"র ভূমিকায় বড়দা আভাস দিয়েছেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত ছন্দ-চিন্তার সূত্রপাত হয় ১৯১৪ সন বা তারও কিছুকাল পূর্বে। বলা যেতে পারে, সে সময়টাই ছিল তাঁর বিপ্লবজীবনের মধ্যাহ্নকাল। সে ভূমিকাতেই বড়দা বলেছেন, 'মোটামুটিভাবে বলা যায়, আধুনিকতম স্বাধীন বিচারবুদ্ধিপ্রসূত ছন্দোবিশ্লেষণ আরম্ভ হয় বিংশ শতকের গোড়া থেকেই।' ভাগ্যক্রমে আমিও সেই ছন্দোবিশ্লেষণের সঙ্গে একেবারে গোড়া থেকেই সংযুক্ত ছিলাম একান্ত ঘনিষ্টভাবে।

বড়দা নিশ্চয়ই আঁচ করেছিলেন যে, বাঙলা কবিতা আর সাহিত্যের প্রতি আমার একটা প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। একদিন হঠাৎ তিনি কয়েকটি কবিতার বই নিয়ে বসলেন। বললেন, 'তোমার তো কবিতা খুব ভালো লাগে। চলো, আমরা এবার একটু তলিয়ে দেখি, বাঙলা কবিতা কত রকম ছন্দে লেখা যায়।' তারপর নানা কবিতা পড়া হল। তার অনেকগুলোই ছিল আমার জানা, কিছু-কিছু কণ্ঠস্থও ছিল। পড়তে বা আবৃত্তি করতে খুবই ভালো লাগত। কবিতা যে নানা ছন্দে নানাভাবে লেখা যায়, তা সহজেই বুঝতে পারতাম এবং সে বৈচিত্র্যও পছন্দ করতাম। তবে বলা বাহুল্য যে, নাবালক কালের সেই পটুত্ব ছিল "অশিক্ষিত", বলা যায় সহজাত। বড়দা এসে প্রথম আমাকে সচেতন করে দিলেন তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, উদাহরণ দিয়ে এবং প্রত্যেকটি উদাহরণকে বিশ্লেষণ করে। শীগগীরই পুর্ণোদ্যমে শুরু হল আমাদের ছন্দচর্চার যুগ।

প্রথম দিনই বড়দা দেখিয়ে দিলেন, বাঙলা ছন্দকে কিভাবে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাদের নাম দিলেন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত। এই তিন বৃত্ত এসে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে দিল এক নূতন জগতের দিকে। তারপরে শুরু হল এককেটি বৃত্ত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা, তাদের নিয়মগুলি নির্ধারণ করা, ব্যতিক্রম খুঁজে বার করা, উদাহরণ সংগ্রহ করে তাদের যথারীতি বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করা। উদাহরণের প্রধান উৎস ছিল রবীন্দ্রনাথ আর সত্যেন দত্ত, "সবুজপত্র" ও অন্যান্য পত্রিকায় ছন্দ সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধ, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন এবং অন্যান্য কবি।

প্রত্যেক বৃত্তকে ভাগ করা হত নানাভাবে। যেমন অক্ষরবৃত্তের বেলা প্রতিপাদে অক্ষরসংখ্যা, পংক্তির দৈর্ঘ্য, যতিস্থাপনের নিয়ম; পয়ার (১৪ অক্ষর), মহাপয়ার (১৮ অক্ষর); পাদ আর পংক্তির বৈচিত্র্যময় বিন্যাস, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের হাতে।

অক্ষরবৃত্ত

মধুসূদন দত্তের কথা তখন তন্ময় হয়ে বড়দার কাছে শুনেছি। ছন্দোজগতে তাঁর আবির্ভাব যেন একটা ধূমকেতুর মতো—"প্যারডাইজ লস্টের" অনুকরণে বাঙলা ভাষায় এনে হাজির করলেন "মেঘনাদ বধ" কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে, পয়ারের মতো প্রত্যেক পংক্তিতে চোদ্দ অক্ষর রেখে, কিন্তু মিলের বালাই উড়িয়ে দিয়ে এবং এক পংক্তি থেকে আরেক পংক্তিতে যাবার পথ সুগম করে দিয়ে। মধুসূদনের এই অপূর্ব দান তখন পুরোপুরি উপভোগ করেছি। তবে আমাদের সে সময়কার আলোচনায় তাকে বলতাম শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং আমাদের দৃষ্টিও নিবদ্ধ ছিল তার মিলশূন্যতার উপর, যদিও লাইনের পর লাইনে অবাধ গতি তখনও মনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছে।

অনেক বছর পরে বড়দা তার নূতন নামকরণ করলেন "প্রবহমান পয়ার" বলে এবং বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই প্রবহমানতাই হল তার আসল বৈশিষ্ট্য, মিলহীনতা নয়। আর সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথ তাকে "পংক্তিলঙ্ঘক" বা "লাইনডিঙানো"র ছন্দ বলে অভিহিত করেছেন। মধুসূদন সম্বন্ধে সত্যেন দত্তের সনেটে একই কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :

পয়ার পায়ের বেড়ি ভাঙি কবিতার
উড়ালে বিদ্রোহধ্বজা, হে কবি বিদ্রোহী।

দুই পায়ে বেড়ি পরে চলার মতো পয়ারকেও চলতে হত চোদ্দ অক্ষরের দুটি পংক্তি নিয়ে, এবং তার শেষে মিল দিয়ে, বেড়ি-পরা পাদুটিকে দু পা এগিয়েই একত্র করার মতো। ফলে তার গতি ছিল শ্লথ এবং একঘেয়ে, ছুটে যাওয়া ছিল তার ক্ষমতার বাইরে। মাইকেল এসে ছিন্ন করে দিলেন এই দুই পংক্তি আর তার মিলের বন্ধন। রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁর এই লাইন ডিঙোবার তাড়না আর দৃষ্টান্তকে—আক্ষরিক অর্থে বলা যেতে পারে তাঁর এই "উচ্ছৃঙ্খলতাকে"—শুধু অনুমোদন নয়, সাগ্রহে বরণ করে নিলেন, এবং তার সঙ্গে যোগ দিলেন মধুরতা, প্রসারতা, নূতনস্বাধীনতা, এবং মসৃণতা।

সংগীত- ও লালিত্য-প্রিয় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতাকে বজায় রাখলেন, কিন্তু মিল দেওয়াটা ত্যাগ করলেন না। ফলে তিনি হলেন প্রবহমান স মি ল পয়ারের স্রষ্টা। দৃষ্টান্ত :

হেথা বেণুমতীতীরে মোর দুইজন
অভিনব স্বর্গলোক কবির সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত। ("কচ ও দেবযানী")

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চোদ্দ অক্ষরের লাইন নিয়ে তুষ্ট থাকতে পারেন নি। সেটা ঠিক বেড়ি না হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে ভাবের বাহন হিসেবে তাকেও সংকীর্ণ বলে মনে করতেন। তাই প্রয়োজনমত তাকে আরো একটু টেনে লম্বা করে দিলেন আঠারো অক্ষরে। সৃষ্টি হল "মহাপয়ারের" নূতন সৌন্দর্য—গাম্ভীর্য এবং ঔদার্য নিয়ে। এক্ষেত্রেও কবি ধ্বনিসংগতির খাতিরে মিল বর্জন করতে নারাজ। সমিল মহাপয়ারের দুটি দৃষ্টান্ত :

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ("এবার ফিরাও মোরে")

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে ?
("সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত")

রবীন্দ্রনাথ এখানেই থামলেন না। এই পয়ার-মহাপয়ারের মধ্যেও তিনি অনুভব করলেন আরো একটি নিগূঢ় বন্ধন বা "বেড়ি"। প্রতি পংক্তির সমান দৈর্ঘ্য অর্থাৎ সমসংখ্যক অক্ষর। এবার তাই আরম্ভ করলেন এই পংক্তিগুলোকেও ভেঙেচুরে নানা দৈর্ঘ্যে নিজের খেয়ালমতো সাজাতে। তার ফলে সৃষ্ট হল মিশ্রপংক্তির সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দে লিখিত কবিতায় পংক্তির দৈর্ঘ্য হতে পারে চার থেকে আঠারো অক্ষর পর্যন্ত। তার দৃষ্টান্ত ছড়ানো রয়েছে "বলাকা"র পাতায়-পাতায় :

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন থাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
...
মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
("বলাকা")

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
...
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
খসিয়া খসিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে ;
("চঞ্চলা")

একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
...
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।
("শা-জাহান")

দৃষ্টান্তগুলির অনেকখানি উদ্ধৃত করা হল পংক্তির বৈচিত্র্য দেখাবার জন্য। তার সঙ্গে রয়েছে অকৃত্রিম প্রবাহ এবং মিল ও ধ্বনির মাধুর্য। পংক্তিকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বন্ধন হতে মুক্তিদান—এটিও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দান।

উপরের সবগুলো দৃষ্টান্তেই দুটো জিনিস বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় : কোনো পংক্তিতেই বিজোড়সংখ্যক অক্ষর নেই, আর সবগুলো কবিতাতেই যতি পড়েছে জোড়সংখ্যক অক্ষরের পরে, অর্থাৎ চার, ছয়, আট বা দশ অক্ষরের পরে—কোথাও তিন, পাঁচ, সাত, নয় বা এগারো অক্ষরের পরে নয়। অল্প কিছুদিন হাতড়িয়েই রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই মহামূল্য তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার পর থেকে তাঁর বেলা কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

আমিও বড়দার কাছ থেকে এ আইনটি শিখে-ছিলাম বহুকাল আগে, আমার বাঙলা ছন্দে হাতে-খড়ির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। আর বড়দা বোধ হয় এ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং তাঁর ছন্দোবিষয়ক প্রবন্ধ পড়ে। ভুল স্থলে, অর্থাৎ বিজোড়-সংখ্যক অক্ষরের পর, যতিস্থাপনে ছন্দ কিভাবে দুষ্ট হয় তার উদাহরণ বড়দা সে সময়ই অনেক দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তা নিয়ে আরো অনেক আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে আর প্রবন্ধে।

অযথাস্থানে যতিস্থাপনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে "মেঘনাদ বধ" কাব্যে। যে-বিদ্রোহী কবি পয়ারের সব আইনকানুন চুরমার করে মুক্তছন্দের নবযুগ ডেকে আনলেন, তিনি যে যতিস্থাপনের বেলাও নিজের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন, তাতে আর বিচিত্র কী? তবু মুশকিল এই যে, পূর্বপ্রচলিত আইনকানুনগুলো ছিল সংস্কারগত ; যতিস্থাপনের নিয়মটি হল বাঙলা-ভাষার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত, অর্থাৎ তাকে অমান্য করলে ধ্বনিতে অসংগতি দেখা দেয়, কান প্রতিবাদ করে। এ নিয়মের তাৎপর্য হল তাই, আর সেজন্যই তাকে লঙ্ঘন করলে ছন্দে ত্রুটি ঘটে একরকম অনিবার্যরূপে।

তবু স্বীকার করতে হবে যে, মধুসূদন এ নিয়ম সম্বন্ধে সচেতন না থাকলেও কার্যত তা মেনে নিয়ে-ছিলেন, নিজের অসামান্য প্রতিভা এবং প্রখর শ্রবণ-শক্তির কল্যাণে। তাই অসমসংখ্যক অক্ষরের পরে যতিস্থাপনের সংখ্যা সমগ্র মেঘনাদ বধ কাব্যের তুলনায় অতি সামান্যই। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করলে অবান্তর হবে না, যা নিয়ে অতীতে বিজ্ঞদের মধ্যে বেশ কিছু বিতর্ক হয়েছে। "মেঘনাদ বধ" কাব্যের আরম্ভেই রয়েছে—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণী,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
রাঘবারি।

ভ্রূকুঞ্চন করা হয় এই 'অকালে' শব্দটি নিয়ে,

কারণ তিন অক্ষরের পরে যতিস্থাপন নিয়মবিরুদ্ধ এবং তাতে ছন্দোভঙ্গ হয়। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, 'বীরবাহুর অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল' (বড়দার "ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ", ১৯৮৭, পৃ ২৬)। আমার কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই ভাঙা ছন্দই বিশেষ মনঃপুত। কারণ বীরবাহুর আকস্মিক পতন যে কত বড়ো দুরদৃষ্ট, তা যেন এই ছন্দপতনের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে, অর্থাৎ ভাঙা মন যেন ভাঙা ছন্দেরই অপেক্ষা রাখে। তাই ছোটোবেলা থেকেই এই ব্যতিক্রমটিকে আমি নিজের মনে সমর্থন করে এসেছি এবং তাতে মধুসূদনের প্রতিভারই পরিচয় রয়েছে বলে মনে করি।

একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে
কাঁদেন রাঘবরাঞ্ছা আঁধার কুটিরে—
নীরবে।

এক্ষেত্রেও অনেকে সরবে প্রতিবাদ করবেন, তিন অক্ষরের "নীরবে" শব্দটির পরে যতি দেওয়া হয়েছে বলে। আমি কিন্তু এক্ষেত্রেও কবির নিরঙ্কুশ হবার অধিকার সানন্দে মেনে নেব। কারণ, ধ্বনি আর অর্থের দিক থেকে আমার কান আর মন সহজেই সায় দেয়।

পরবর্তী কালে বড়দা লিখেছেন, কবিতার মাঝখানে হঠাৎ একটি 'সঙ্গীহীন পংক্তি' পেলে তিনি বিশেষ উল্লসিত বোধ করতেন। যেমন—

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

প্রথম লাইনটি নিঃসঙ্গ এবং মিলশূন্য, অথচ এই ব্যতিক্রমটিই ছন্দের একটানা প্রবাহ আচমকা থামিয়ে মনের টনক নাড়িয়ে তাকে আসল বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। 'অকালে' আর 'নীরবে'—এই দুইটি শব্দের বেলাও আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া অনেকটা অনুরূপ।

তবু ব্যতিক্রমকে ব্যতিক্রম বলেই মানতে হবে, তার বেশি নয়। ভাষার মৌলিক নিয়মকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ক্রমাগত লঙ্ঘন করে গেলে তাতে ছন্দ পদে-পদে হোঁচট খাবে, এবং কাব্য বা কবিতার মাধুর্যও খর্ব হবে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে জোড়সংখ্যক অক্ষরের পরে যতিস্থাপনের নিয়মটি রবীন্দ্রনাথ অল্পায়াসেই আবিষ্কার করেছিলেন। বড়দা লিখে গেছেন যে, তারপর থেকে তিনি কবির লেখায় কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখেন নি।

আবার কৈশোরে ফিরে যাওয়া যাক। দীর্ঘ আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে চলত ছন্দোবিশ্লেষণ, তার অ্যানাটমি নির্ণয়, যথা : প্রতি ছত্রে অক্ষরসংখ্যা, পাদ বা পর্বের সংখ্যা, পংক্তিবিন্যাস এবং তার বৈশিষ্ট্য, কোথায়-কোথায় মিল, ইত্যাদি। সংখ্যা দিয়ে ছক কেটে তা যথাসম্ভব দেখানো হত। আলোচনা হয়ে গেলে উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে সাজিয়ে লিখবার ভার ছিল আমার উপর। লেখা হয়ে গেলে বড়দা সেগুলো মন দিয়ে দেখতেন। আমার আগ্রহ, তৎপরতা এবং নিখুঁত হবার প্রয়াস দেখে তিনি খুব খুশি ছিলেন। আর সেজন্যই বোধ হয় তিনি নিজে কলম হাতে ছন্দ নিয়ে কিছু লেখা তখনো শুরু করেন নি। সে সুদীর্ঘ, বিরাট পর্ব আরম্ভ হয় আরো বেশ কিছুকাল পরে।

মাত্রাবৃত্ত

এ ছন্দের রহস্য আয়ত্ত করতে আমার বেশি সময় লাগে নি। মন যেন আপনা থেকেই তার জন্য অনেকটা তৈরি ছিল। বড়দা এ ছন্দের গোপন তথ্যটি কয়েকটি কথায় উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। অক্ষরবৃত্তে যুক্তাক্ষর ও অযুক্তাক্ষরকে একই মূল্য দেওয়া হয়, যদিও যুক্তাক্ষরের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্যের উপর তার গাম্ভীর্য আর ঔদার্য অনেকখানি নির্ভর করে। মাত্রাবৃত্তে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনান্ত যুক্তাক্ষরকে এবং ঐ (অই) ও ঔ (অউ) এ দুটি স্বরবর্ণকে দীর্ঘ বলে গুনতে হয়, অর্থাৎ তাদের দুই মাত্রা করে দিতে হয়। যথা : 'প্রথা' দুই মাত্রা, 'প্রত্ন' তিন মাত্রা ; 'ক্ষোভ' দুই মাত্রা, 'বিক্ষোভ' চারমাত্রা ; 'ভৈরব', 'গৌরব' চার মাত্রা। অক্ষরবৃত্তে প্রথম তিনটি শব্দ দুই অক্ষরের, শেষের তিনটি শব্দ তিন অক্ষরের। নিয়মটি খুবই সহজ, কিন্তু তার ফল সুদূরপ্রসারী।

এই সাধারণ আইনের সুনিয়মিত প্রয়োগ বাঙলা ছন্দে এক নূতন জীবন সঞ্চার করে দিল। "ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ"-এ বড়দা দেখিয়েছেন, তরুণ বয়সে যুক্তবর্ণের ব্যবহারে কবি কেমন কুণ্ঠা বোধ করতেন। অথচ পরিণত বয়সে সেই রবীন্দ্রনাথই কেমন করে 'প্রয়োজনমত যুক্তবর্ণসূচিত ব্যঞ্জনসংঘাতের বজ্রকরতালি বাজিয়ে ছন্দকে উদ্বেল করে তুলেছেন।' বড়দা এ মন্তব্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিবর্তন দেখাতে গিয়ে। মাত্রাবৃত্তের বেলাও কিন্তু একই কথা বলা চলে। তবে ধ্বনিবৈষম্যের জন্য অলঙ্কারেও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন। তাই বলতে হয়, দ্বিমাত্রিক যুক্তবর্ণের সুনিপুণ ব্যবহার দ্বারা কবি তাঁর মৃদঙ্গে নূতন-নূতন তাল তুলে ছন্দকে তরঙ্গায়িত, আবার কোনো-কোনো সময় উত্তাল করে তুলেছেন। যেমন :

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজ্ঞাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
কেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
("দুঃসময়", কল্পনা)

অথবা

ওগো, পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল!
দে দোল্ দোল্।
পশ্চাৎ হতে হা হা ক'রে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল।
আকাশে বাতাসে পাগলে মাতালে হট্টগোল।
দে দোল্ দোল্॥
("ঝুলন", সোনার তরী)

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথই হলেন বাঙলা ভাষায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা। যদিও এ বৃত্তের নিগূঢ় নিয়মটি বস্তুত খুবই সহজ, তবু তা পুরোপুরি আবিষ্কার আর আয়ত্ত করতে রবীন্দ্রনাথেরও বেশ কিছু সময় লেগেছিল। কবির হাতে তার ক্রমবিকাশ ঝড়দা তাঁর পরবর্তী লেখায়, বিশেষ করে তাঁর "ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে, নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে অতি সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই বিবর্তনের যুগে অর্ধস্ফুট মাত্রাবৃত্তে যুক্তাক্ষর মাঝে-মাঝে অক্ষরবৃত্তের মতো একমাত্রিক রূপ ধারণ করে ধ্বনিতে অসংগতির সৃষ্টি করেছে। আমাদের ছন্দ আলোচনার যুগেও সে ধরনের উদাহরণ বেশ কিছু সংগ্রহ করেছিলাম। একটি লাইনের কথা এখনো বেশ মনে পড়ে—

কালি রজনীতে। ঝড় হয়ে গেছে। রজনীগন্ধার। বনে।

তখন পরিভাষায় এ লাইনটিকে বলা হত যন্মাত্রিক, অপূর্ণ চৌপদী মাত্রাবৃত্ত। অর্থাৎ প্রতি পদে ছটি করে মাত্রা, কেবল শেষ পদে চুই মাত্রা, তাই তা অপূর্ণ। কিন্তু তৃতীয় পদে "রজনীগন্ধার" যুক্তাক্ষরকেও মাত্র একমাত্রা দেওয়া হয়েছে, মাত্রাবৃত্তের ধ্বনিসংগতির নিয়ম লঙ্ঘন করে। কেবল 'রজনীগন্ধাবনে' বললে এ বিচ্যুতি ঘটত না। বড়দা আর আমি এ সম্বন্ধে একমত ছিলাম।

বছর দশেক পরে বড়দা যখন ছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম আলোচনা করেন (১৯৩২, মার্চ), তখন তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে এই লাইনটির কথা তুলেছিলেন। কবি মানলেন না যে, তৃতীয় পদে একমাত্রার আধিক্য রয়েছে এবং তাতে কোনো ত্রুটি ঘটেছে। তিনি সে লাইনটিকে নিজের ভাবে পড়লেন, তৃতীয় পদটিকে টেনে অনেকটা লম্বা করে···'রজনীগন্ধা·····র বনে'। তা নিয়ে বড়দা আর আমি খানিকটা হাসাহাসি করেছিলাম, মজা লাগল বলে। যিনি কবিসম্রাট, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আবিষ্কারক আর প্রবর্তক এবং তার সুদক্ষ আর সুতীক্ষ্ণ বিচারক, তিনিও হঠাৎ খেয়ালের

বশে ছন্দের মধ্যে সুর জুড়ে দিয়ে নিজের বহুসাধনায় লব্ধ আর সুপরীক্ষিত তথ্যটি ভুলে গেলেন!

রবীন্দ্রনাথের সুপরিপক্ব হস্তে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ তার পূর্ণবিকাশ লাভ করে তাঁর "মানসী" রচনার যুগে, সে কথা আমাদের ছন্দচর্চার দিনেও ভালো করেই জানা ছিল। তবে "মানসী" যুগের প্রায় এক শতাব্দী পরে বড়দা নূতন করে উজ্জ্বলতর ভাষায় সেকথা বলেছেন তাঁর "ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে: 'অবশেষে "মানসী" রচনার সময়ে যখন ওই অলক্ষ্য প্রেরণা চেতনার সীমার মধ্যে এসে প্রচলিত সংস্কারের উপর জয়ী হল, অর্থাৎ যখন তিনি নিজেকে যথার্থভাবে আবিষ্কার করলেন, তখনই অক্ষরসংখ্যার কৃত্রিম বাধা গেল ঘুচে, আর তাতেই অবরুদ্ধ কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের উৎসমুখ খুলে গেল। ফলে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রএ নব ছন্দের খরপ্রবাহে প্লাবিত হয়ে গেল।' (পৃ ৯)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে "মানসী" যুগকে যে একটি বিশেষ স্থান দিতেন সে কথা তাঁর নিজের মুখে শুনেছি। ১৯৪০ সনে তাঁর মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে তিনি ঠিক করলেন শান্তিনিকেতনে সপ্তাহে একদিন বিকেলবেলা নিজের কবিতা পাঠ করবেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করবেন বিশ্বভারতীর আট-দশ জন কর্মীকে নিয়ে। সে সময় আমি ছিলাম শ্রীনিকেতনে এখানকার অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা-রূপে। তাই আমি আর আমার সহকর্মী বন্ধু, তখনকার শ্রীনিকেতনের কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার চাটার্জি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের এই অপূর্ব 'সেমিনারে' যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথমেই কবি হাতে নিলেন "মানসী", আর পড়লেন তার প্রথম কবিতাটি বহু দরদ দিয়ে, বার্ধক্যের জড়িমাকে তুচ্ছ করে, ভাববিভোর কণ্ঠে ছন্দের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সুর মিলিয়ে:

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে।

এই কবিতাটি লেখবার বেলা তাঁর কী মনোভাব ছিল প্রথমে সেকথা বললেন। তারপর বিশ্লেষণ করে বোঝালেন তাঁর রচনাকৌশল—'ভুল' শব্দটি বলা হয়েছে বারবার নানা আকারে; আর প্রতিটি স্ট্যান্‌জা বা স্তবকের শেষে রয়েছে ছুটি কথা—'এসেছি ভুলে', গানের ধুয়ার মতো। এই ছুটি শব্দ নানা ছলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার বলার ফলে কানে আর প্রাণে জেগে ওঠে একটি সুন্দর ভাবের আবেগ।

তারপর কবি বললেন এই কবিতাটির ছন্দের কথা, যা আমাদের পক্ষে এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। হঠাৎ তাঁর মনে জেগে উঠল এক নূতন ছন্দ তার অপূর্ব ধ্বনি আর তরঙ্গ নিয়ে। বহুকাল ধরে অজানিত-ভাবে নিজের মনে যে-রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে আসছিলেন, "মানসী"-তে হাত দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার স্বরূপ যেন স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে তাঁর চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল। তখন কিছুকাল কেবল এই ছন্দই নানা রূপ ধরে দিনের পর দিন তাঁর মনকে প্লাবিত করে দিচ্ছিল। কবির সেই উচ্ছ্বাসবহুল বর্ণনা শুনতে-শুনতে আমাদের তখন মনে হচ্ছিল যেন তিনি স্তিমিত নেত্রে আবার সেই "মানসী" যুগের মানসজগতে চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন যা আবিষ্কার করলেন তা তিনি ছন্দের পরিভাষা দিয়ে পরিষ্কারভাবে আমাদের না বললেও বড়দা আর আমার কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না, সেই তরুণকালে ছন্দচর্চার দিনেই তা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক হাতড়াবার পরে "মানসী"-তে এসে কবির সম্পূর্ণ করায়ত্ত হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, তার ছুটি প্রধান নিয়মসহ: প্রথমত, প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনান্ত যুক্তাক্ষর বা সিলেবলকে দিতে হবে দ্বিগুণ মূল্য বা মাত্রা। 'ঐ' ও 'ঔ'—এ ছুটি স্বরবর্ণেরও তাই প্রাপ্য, কারণ তারা বস্তুত 'অই' এবং 'অউ', অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক স্বর। দ্বিতীয়ত, এই ছন্দে রচিত কবিতার প্রত্যেকটি পদে থাকবে চার, পাঁচ কি ছয় মাত্রা। সাত মাত্রাও চলতে পারে, তবে তা তিন+চার বা চার+তিন—

এভাবে ভাগ করে।

অক্ষরবৃত্ত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করার পরে বড়দার ভাষায় বাঙলার 'কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্র' এই নবাবিষ্কৃত কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের 'খর-প্রবাহে প্লাবিত হয়ে গেল।' সেই খরপ্রবাহে অক্ষর-বৃত্ত একবার মাত্র অতর্কিতে সামান্য একটু বাধার সৃষ্টি করেছিল, তা-ও "মানসী"রই একটি কবিতায়: 'উষা কি তাহার শুকতারাহারা', ইত্যাদি। বড়দা দেখিয়েছেন যে, এই কবিতার তিনটি স্থলে কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের নীতি স্খলিত হয়েছে, অর্থাৎ ছুই মাত্রার বদলে একমাত্রা দেওয়া হয়েছে, যদিও অন্য পাঁচটি জায়গায় সে নীতি যথোচিত ভাবে রক্ষিত হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে বড়দা মন্তব্য করেছেন যে, 'পরবর্তী কালের রচনায় এ-রকম শৈথিল্যের নিদর্শন দেখা যায় না।'

আবার তরুণ কালের ছন্দের স্কুলে ফিরে যাওয়া যাক। তখন কিছুদিন একটানা চলেছিল মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এবং তার নাড়ীনক্ষত্র বিশ্লেষণ, যথা: প্রতিপাদে মাত্রাসংখ্যা, প্রতিছত্রে পাদসংখ্যা, শেষ পাদ পূর্ণ না অপূর্ণ, অপূর্ণ হলে কত মাত্রার অভাবে অপূর্ণ, প্রতি স্ট্যান্‌জা বা স্তবকে পাদ- ও ছত্রবিন্যাস, এবং মিলের বৈশিষ্ট্য। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রতিপাদে চার, পাঁচ বা ছয় মাত্রাই সাধারণ রীতি। তিন+চারের মিশ্রণে সাতমাত্রার পাদও সহজেই চলতে পারে। চার+তিনের মিশ্রণে সাতমাত্রার পাদ সম্ভব হলেও সে-সময় তার উপর তেমন জোর দেওয়া হয় নি।

এই সবকিছুর সংমিশ্রণে বাঙলা কাব্যসাহিত্যে এক বিচিত্র ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়েছে। তখন দিনের পর দিন অনেক কবিতার অ্যানাটমি নির্ণয় করতে হয়েছে, এবং বড়দার সঙ্গে আলোচনার পর তাদের যথারীতি নামকরণ করে গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি। প্রায় সাত দশক পরেও তার অনেক কিছু এখনো মনে গেঁথে রয়েছে। যেমন:

ফাল্গুন। চঞ্চল। ফোটাফুল। রয় না,
অবহেলে। ফেলে দেয়। পুষ্পের। গন্ধনা।
(চতুর্মাত্রপাদ, অপূর্ণ চৌপদী, ৪+৪+৪+৩)

পঞ্চশরে। দগ্ধ করে। করেছ একি। সন্ন্যাসী,
বিশ্বময়। দিয়েছ তারে। ছড়ায়ে!
(পঞ্চমাত্রপাদ, প্রথম ছত্র অপূর্ণ চৌপদী, ৫+৫+৫+৪
দ্বিতীয় ছত্র অপূর্ণ ত্রিপদী, ৫+৫+৩)

জগতের মাঝে। কত বিচিত্র। তুমি হে
তুমি বিচিত্র-। রূপিণী।
অযুত আলোকে। ঝলসিছ নীল। গগনে,
আকুলপুলকে। উলসিছ ফুল। কাননে,
ছ্যালোকে ভূলোকে। বিলসিছ চল। চরণে
তুমি চঞ্চল-। গামিনী।
(সপ্তমাত্রপাদ: প্রথম ছত্র অপূর্ণ ত্রিপদী ৬+৬+৩
দ্বিতীয় ছত্র অপূর্ণ দ্বিপদী ৬+৩
পরবর্তী তিন ছত্র: প্রথম ছত্রের মতো ৬+৬+৩
শেষ ছত্র: দ্বিতীয় ছত্রের মতো ৬+৩)

ভারত আমার,। ভারত আমার,। যেখানে মানব।
মেলিল নেত্র।
জ্ঞানরবিমায়। ধন্য অয়িমা,। এশিয়ার তুমি।
তীর্থক্ষেত্র।
(ষন্মাত্রপাদ, পূর্ণ চৌপদী, ৬+৬+৬+৫)

আজি, রক্ত। নিশিভোরে
একি এ। তনি ওরে
মুক্তি। কোলাহল। বন্দী। শৃঙ্খলে!
ঐ কাহারা। কারাবাসে
মুক্তি-। হাসি হাসে,
টুটেছে। ভয়বাধা। স্বাধীন। হিয়াতলে॥
(সপ্তমাত্রপাদ ৩+৪, পূর্ণ চৌপদী)

ফাগুন এল। দ্বারে,
ঘরে যে কেহ নাই।
পরান ডাকে। কারে
ভাবিয়া নাহি। পাই।
(পঞ্চমাত্রপাদ, অপূর্ণ দ্বিপদী ৫+২)
অথবা
ফাগুন। এল দ্বারে,

ঘরে যে। কেহ নাই।
পরান। ডাকে কারে
ভাবিয়া। নাহি পাই।
(সপ্তমাত্রপাদ ৩+৪, পূর্ণ একপদী বা দ্বিপদী)

দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতাটি, যা তিনি আমাদের ছন্দচর্চার যুগেই রচনা করেন এবং আমাদের বাড়িতে এসে স্বয়ং আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করে আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়ে যান। কাজী নজরুলের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং তার পটভূমিকার উপর পরে যথাস্থানে আলোকপাত করব। সে প্রসঙ্গে তাঁর "বিদ্রোহী" এবং তখনকার অন্য কবিতা সম্বন্ধেও কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য করার ইচ্ছে রইল। তবে এ ক্ষেত্রে অন্তত এটুকু বলা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ "বলাকা", "শা-জাহান", "ছবি", "চঞ্চলা" ইত্যাদি কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে মুক্তবন্ধ, প্রবহমান সমিল কবিতা রচনার প্রবর্তন করেছিলেন, কাজী নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা দিয়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সে পদ্ধতিই পুর্ণোদ্যমে চালু করে দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিলেন।

আমাদের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ আলোচনার আরও একটা দিক ছিল যা কৃত্রিম হলেও উল্লেখযোগ্য। বাঙলায় দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় না সংস্কৃতের মতো, তার হ্রস্ব উচ্চারণই স্বাভাবিক নিয়ম। তবু কবিরা মাঝে-মাঝে তাকে দুই মাত্রা দিয়ে রচনা করে যেন পরম তৃপ্তি লাভ করেন। আধুনিক যুগে সে-জাতীয় কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্যতম, এমনকী অগ্রগণ্য। রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অবশ্য এ ধরনের রচনার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রয়েছে। আমরা তাদের বেশ কিছু সংগ্রহ করে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রীতি অনুসারে তাদের গঠনপ্রণালী বিশ্লেষণ করেছিলাম। এ-জাতীয় রচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে সংক্ষেপে উদ্‌দৃত করা হল :

(ক) সাংস্কৃতিক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ—

(১) শুভ- শঙ্খ বাজহ। বাজ হে,
ঘন- তিমির রাত্রির। চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ। জ্যোতির্দীক্ষা
যাত্রিদল সব। সাজ হে।

(২) দেশ দেশ। নন্দিত করি। মন্দ্রিত তব। ভেরী,
আসিল যত। বীরবৃন্দ। আসন তব। ঘেরি।

(৩) হিংসায় উন্। মত্ত পৃথ্বী
নিত্য নিঠুর। দ্বন্দ্ব।
ঘোর কুটিল। পন্থ তার
লোভজটিল। বদ্ধ।

(৪) জনগণ। মন অধি-। নায়ক। জয় হে
ভারত-। ভাগ্যবি-। ধাতা।

লক্ষ করা উচিত যে, এই সবগুলো কবিতাই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, এবং সুর দিয়ে উদাত্ত সঙ্গীতরূপে ব্যবহারের জন্য।

(খ) রবীন্দ্রপূর্ব যুগে—

(১) পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !
শ্যামবিটপিঘন তটবিগাহিনি,
ধূসর-তরঙ্গ-ভঙ্গে !

(২) রে সতি, রে সতি ! কাঁদিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।

আমরা এ দুটো কবিতাকেই চতুর্মাত্রপাদ বলে অভিহিত করেছিলাম। বড়দা পরে তাদের চার+চার যোগ দিয়ে অষ্টমাত্রপাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আগেই বলেছি আমরা আমাদের ছন্দচর্চার যুগে চার, পাঁচ আর ছয় মাত্রার পাদ অতিক্রম করতে চাই নি। তাই সাতকেও ভেঙে তখন আমরা তিন+চারের দলে ফেলেছিলাম। যেমন :

জীবনে যত পুজা। হল না সারা
জানি হে জানি তাও। হয় নি হারা।
(৩+৪+৩+২ অর্থাৎ তিন-চার মাত্রার মিশ্রণে
দ্বিপদী অপূর্ণ সপ্তমাত্রপাদ)

সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারিত বঙ্গভাষায় একটি ব্যঙ্গ কবিতা সে সময় আমাদের বিশেষ পছন্দ হয়েছিল :

চাপাননিভৃত প্রাতে
ইংরাজ লাটসাহিব
পড়িয়া এ মহাবার্তা
আতঙ্কে তু বিমূর্ছিত।

অতীত স্মৃতির আকর্ষণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আলোচনা হয়তো কিছুটা মাত্রা অতিক্রম করে গেছে। তাই এবার ছন্দচর্চার শেষ পর্বের দিকে মন দেওয়া যাক।

স্বরবৃত্ত

আমাদের প্রথম ছন্দালোচনার সময় বড়দা স্বরবৃত্ত ছন্দের একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, যা তার নাম থেকেই মোটামুটি আঁচ করা যায়। এ ছন্দের ভিত্তি হল স্বর—অক্ষর বা মাত্রা নয়। তবে স্বর মানে এক্ষেত্রে বর্ণমালার স্বরবর্ণ নয়, ধ্বনিতত্ত্বের স্বর; যাকে ইংরেজিতে বলা হয় সিলেব্‌ল্। (এই সিলেব্‌ল্ শব্দটি ইংরেজিতে আট অক্ষর দিয়ে লেখা হয়, বাঙলাতে বলা যায় চার অক্ষর, কিন্তু তাতে সিলেব্‌ল্ আছে মাত্র দুটি) লিখিত বর্ণমালায় অনেক সময় দুই স্বর থাকলেও তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের দিক থেকে এক স্বর (সিলেব্‌ল্) বলেই গুনতে হয়, যেমন আই, এই, ওই, এও ইত্যাদি, অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষে অই (ঐ) আর অউ (ঔ)-এর অনুরূপ।

তবে এই স্বরগণনার রীতির একটি ব্যতিক্রম আছে, যদিও তা আদতে মূল রীতিরই রূপান্তরমাত্র বলা যেতে পারে। সেটা হল—অসমাপ্ত ক্রিয়া নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে ing-প্রত্যয়ান্ত present participle বলা হয় : লাফিয়ে, কাঁপিয়ে, ঝাঁপিয়ে, ফাঁপিয়ে, হাসিয়ে, কাঁদিয়ে ইত্যাদির 'ইয়ে'-কে একস্বর ধরা হয় যদি কবিতার পাদে তাদের পরে যতি না পড়ে; যতি থাকলে তারা দ্বি-স্বর হয়ে যায়। 'অমন, আড়াল দিয়ে। লুকিয়ে গেলে। চলবে না'—এখানে 'লুকিয়ে' দ্বি-স্বর তার পরে যতি নেই বলে। কিন্তু যদি বলি—

মস্তকে তাঁর। দাও পরিয়ে। স্বর্ণমুকুট-। খানি

তা হলে 'পরিয়ে'-এর ইয়েকে দ্বিস্বর এবং শব্দটিকে তিনস্বর বলে গুনতে হবে, তার পরে যতি রয়েছে বলে। আসল কথা এই যে, 'ইয়ে'র পরে যতি না থাকলে তা হয় দ্রুত এবং অর্ধ-উচ্চারিত, আর যতি থাকলে তা হয় স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ-উচ্চারিত। সেজন্যই 'ইয়ে'-কে বলা যেতে পারে মূল নিয়মের আপাতব্যতিক্রম মাত্র।

সর্বোপরি, স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রাকৃত বা কথিত বাঙলায় কাব্যরচনার এটাই হল একমাত্র বাহন। এখানে অক্ষর- বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ, তাদের প্রয়োগক্ষেত্রে একমাত্র সাধু বাঙলা। সাধু বাঙলার ক্রিয়াগুলো কথিত বাঙলায় রূপান্তরিত হয়ে যায় যথাসম্ভব স্বরবর্ণ বর্জন করে, যেমন খাচ্ছি, যাচ্ছি; ধর্‌ব, কর্‌ব; বাঁচ্‌ত, মর্‌ত; হাসলাম, কাঁদলাল। এই হসন্তবহুল কথিত বাঙলাই হল স্বরবৃত্ত ছন্দের মালমসলা, তার প্রাণ! অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, স্বরের অভাব বা অপ্রাচুর্যই হল স্বরবৃত্ত ছন্দের শক্তির প্রধান উৎস। স্বরবহুল সাধু বাঙলাকে কথিত বাঙলায় কৃত্রিম উপায়ে স্বরসঙ্কুচিত করা হয় বলেই তাতে ইংরেজির মতো সিলেব্‌ল্ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়।

আর সেজন্যই ইংরেজির প্রধান পাঁচটি ছন্দই যৎসামান্য কসরত করে বাঙলায় অনুকরণ করা যায়। বহুদশক আগে সত্যেন দত্ত তাঁর সুনিপুণ হস্তে কথিত বাঙলাকে ইংরেজি ছন্দের ছাঁচে ঢেলে তা সপ্রমাণ করে গেছেন। আমরা তার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত সাগ্রহে সংগ্রহ করে যথারীতি লেব্‌ল্ সেঁটে লিপিবদ্ধ করেছিলাম, ইঙ্গবঙ্গ ছন্দের নমুনাস্বরূপ। তা ছাড়াও তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে বহু কারুকার্য করে গেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ, "প্রবাসী", "সবুজপত্র" ও অন্যান্য জায়গা থেকে সেসব আহরণ করে যথাসম্ভব গুছিয়ে রেখেছিলাম নামকরণ আর শ্রেণীবিভাগসহ। সেসব দৃষ্টান্ত দিয়ে এ লেখাকে ভারাক্রান্ত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে ছ-সাত দশক পরে এখনও যা মনের মধ্যে

আনাগোনা করে তার কয়েকটি নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করলাম। বাহুল্য মনে করে তাদের কোনো লেবেল্ দিলাম না :

(১) মহং-ভয়ের। মুরং সাগর,
বরন তোমার। তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের। প্রলয়পিনাক
শোনাও আমায়। শোনাও কেবল।
(সত্যেন দত্ত)

(২) সিন্ধুর টিপ। সিংহল দ্বীপ
কাঞ্চনময়। দেশ,
চন্দন যার। অঙ্গের বাস
তাম্বুল বন-। কেশ। (সত্যেন দত্ত)

(৩) একলা পাগ্লা। ফির্ছে জঙ্গল,
কৌপ্নী। কৌটা। রইল। সম্বল। (?)

(৪) ভোম্রায়। গান গায়। চরকায়। শোন্ ভাই,
খেই নাই,। পাঁজ দাও,। আমরাও। গান গাই।
(সত্যেন দত্ত)

(৫) জীবন কি। কেবল রে। দুখ,
তার দেখিস্ নে। আনন্দ-। টুক ?
না না, জীবন সে। ব্যথার তো। নয়
সে যে, অনন্ত। আনন্দ-। ময়।
(প্রবোধচন্দ্র সেন)

(৬) হর-মুকুট ! হর-মুকুট !
ভূ-স্বরগের। সুমেরুকুট !
গগনে প্রায়। ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায়। তারকা লুট। (সত্যেন দত্ত)

এ-জাতীয় রচনায় বাহাদুরি আছে, কিন্তু স্বাভাবিকত্ব নেই। এখানে শব্দ নিয়ে কসরতের প্রয়োজন এত বেশি যে তাতে চিন্তাধারা অতিমাত্রায় ব্যাহত হয়, তাকে জোর করে অতি সংকীর্ণ গলির পথে চালাতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা দেখিয়েছেন, বাঙলা ছন্দের সম্ভাব্যতা বা তার দৌড় কতখানি, ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দও (নীচে দ্রষ্টব্য) এ ভাষায় কেমন সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।

তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, এ ধরনের ছন্দে কাব্যসাহিত্য কখনো দৌড়তে পারে না, কৃত্রিম লঘুগুরুর শিকলি পরে তাকে থমকে-থমকে চলতে হয়। দ্রুতগতি কথিত ভাষার আসল বৈশিষ্ট্য তাতে বহুলপরিমাণে খর্ব হয়ে যায়। সে বৈশিষ্ট্য রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হল চতুঃস্বরপাদ ছন্দ। প্রতিপাদে স্বর বা সিলেব্ল্ থাকবে চারটি করে, যদিও তার বিন্যাস হতে পারে বহুবিধ – অন্য ছন্দের মতোই তার পংক্তি হতে পারে নানা দৈর্ঘ্যের, দ্বিপদী থেকে পঞ্চপদী পর্যন্ত, এবং তা পূর্ণ বা অপূর্ণ হতে পারে এক থেকে তিন স্বরের অভাবে। এখানেও আমাদের সংকলন ছিল প্রচুর, তাদের যথারীতি বিশ্লেষণ ও লেবলসহ। সেই বিশ্লেষণের নমুনা হিসেবে সংক্ষেপে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

শুরুতেই অবশ্য স্থান পেয়েছিল বহু-পরিচিত গোটাকয়েক জনপ্রিয় কবিতা, যেমন :

(১) বৃষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর। নদেয় এল। বান।
(৪+৪+৪+১)
শিবঠাকুরের। বিয়ে হল। তিন কন্যে। দান।
(৪+৪+৪+১ ; 'তিন' বিকল্পে দ্বিস্বর)

(২) রাত পোহাল। ফর্সা হল,। ফুটল কত। ফুল,
(৪+৪+৪+১)
কাঁপিয়ে পাখা। নীল পতাকা। জুটল অলি-। কুল
(৪+৪+৪+১)
(পদের মাঝখানে বলে 'কাঁপিয়ে' দ্বিস্বর)

(৩) খোকা মাকে। শুধায় ডেকে,। 'এলেম আমি।
কোথা থেকে' (৪+৪+৪+৪)
কোনখানে তুই। কুড়িয়ে পেলি। আমারে ?'
(৪+৪+৩, কুড়িয়ে দ্বিস্বর)
মা শুনে কয়। হেসে কেঁদে। খোকারে তার।
বুকে বেঁধে (৪+৪+৩)
'ইচ্ছা হয়ে। ছিলি মনের। মাঝারে॥' „
(রবীন্দ্রনাথ)

(৪) ঝড়ের মাতন। বিজয়-কেতন। নেড়ে (৪+৪+২)

অট্টহাস্যে। আকাশখানা। ফেড়ে „
ভোলানাথের। ঝোলাঝুলি। ঝেড়ে „
ভুলগুলো সব। আন্‌রে বাছা-। বাছা। „
আয় প্রমত্ত,। আয়্ রে আমার। কাঁচা॥ „
(রবীন্দ্রনাথ)

(৫) চোখ আছে যার। দেখছে সে জন,। অন্ধজনে।
দেখবে কি ? (৪+৪+৪+৩)
উষার আগে। আলোর আভাস। সকল চোখে।
ঠেকবে কি ? (৪+৪+৪+৩)
(সত্যেন দত্ত)

(৬) রাত পোহাল,। শুন্‌ছ সখি। দীপ্ত উষার।
মাঙ্গলিক। (৪+৪+৪+৩)
লাজুক তারা,। তাই শুনে কি। পালিয়ে গেল।
দিগ্বিদিক ? (৪+৪+৪+৩)
(ওমর খৈয়াম, অনুবাদ)

(৭) ধ্যানে তোমার। রূপ দেখি গো,। স্বপ্নে তোমার।
চরণ চুমি। (৪+৪+৪+৪)
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি !
(৪+৪+৪+৪)
(সত্যেন দত্ত)

(৮) যারা আমার। সাঁঝসকালের। গানের দীপে।
জালিয়ে দিলে। আলো
(৪+৪+৪+৪+২)
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল
সাদা-কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা··· (রবীন্দ্রনাথ)

এই কবিতাটি কথিত বাঙলায় রচিত হলেও অনেক উচ্চসুরে বাঁধা। তার কারণ হল দুটি; প্রথমত, চতুঃস্বরপাদ হলেও এটি পঞ্চপদী, অর্থাৎ প্রত্যেকটি পংক্তিতে রয়েছে ১৮টি স্বর, চারটি পূর্ণ ও একটি দুই স্বরের অপূর্ণ পাদ জড়িয়ে। এইটিই তার চরম দৈর্ঘ্য, তার চেয়ে বেশি ভার বহন করা একটি পংক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এই দৈর্ঘ্য পংক্তিটির মধ্যে এনে দিয়েছে এক নূতন গাম্ভীর্য আর ঔদার্য। দ্বিতীয়ত, এটি প্রবহমান, অর্থাৎ 'পংক্তি-লঙ্ঘক' বা 'লাইন-ডিঙানো' রীতিতে লিখিত, তথাকথিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো, তবে মিলসহ। অক্ষরবৃত্তের প্রবহমান অষ্টাদশ অক্ষরের মহাপয়ারের সঙ্গে তার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট, যার দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে ('বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে, বাজাইল বজ্রভেরী', ইত্যাদি)।

বড়দা বহুকাল বিশেষ ইচ্ছা এবং আশা পোষণ করেছিলেন যে, বাঙালি কবিরা প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অনুকরণে স্বরবৃত্ত ছন্দেও সে-জাতীয় কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হবেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস পূর্বে তাঁকে সে অনুরোধ করে তিনি একখানি চিঠিও দিয়েছিলেন। স্বরবৃত্ত ছন্দে এই নূতন প্রয়াসের কথা দূরে থাকুক, বাঙলা সাহিত্যে কাব্য-স্রোত বেশ কিছুকাল ধরে বেপরোয়াভাবে বয়ে চলেছে সম্পূর্ণ অন্যদিকে—ছন্দোবিমুখ গদ্যপদ্যের অভিমুখে।

সংস্কৃত ছন্দ

আমাদের ছন্দচর্চা শুধু এই তিন বৃত্তে পর্যবসিত হয় নি। একদিন বড়দা আমার হাতে তুলে দিলেন এক-খণ্ড "ছন্দোমঞ্জরী"। এইটিই হল সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ। কিছুদিনের মধ্যেই নানাছন্দের নাম আর সূত্র শিখে নিলাম—অনুষ্টুপ, মালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা, ইত্যাদি। তার সঙ্গে-সঙ্গে পড়েছিলাম এবং টোলের ছাত্রদের মতো মুখস্থ করেছিলাম নানাছন্দের অনেক সংস্কৃত শ্লোক।

এখনও মনে আছে, সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকারদের উদ্ভাবনীশক্তি দেখে কেমন চমৎকৃত হয়েছিলাম। প্রত্যেকটি ছন্দের জন্য তাঁরা রচনা করেছেন একটি নিয়ম বা সূত্র—এক লাইনের। তারি মধ্যে সুচারু-ভাবে, সাংকেতিক উপায়ে বলা হয়েছে তার মোট অক্ষরসংখ্যা, প্রতিটি হ্রস্ব আর দীর্ঘ স্বরের বা মাত্রার বিন্যাস, এবং যথাস্থানে যতিস্থাপন। শুধু তাই নয়, ছত্রটিও রচনা করা হয়েছে যে-ছন্দের সূত্র হুবহু সেই

ছন্দেই—তার নমুনা বা মডেলস্বরূপ। যেমন মালিনী ছন্দের সংজ্ঞা :

ননমযযু তেয়ং। মালিনী ভোগিলোকৈঃ

কালিদাসের শকুন্তলার দুষ্যন্ত যখন দ্রুতধাবমান ভীরু মৃগশিশুর উপর বাণ নিক্ষেপে উদ্যত হলেন, তখন তাঁকে নিরস্ত করার জন্য ঋষি উত্তোলিত হস্তে ব্যাকুলকণ্ঠে মালিনী ছন্দে বলে উঠলেন :

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলম্
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারা শরাস্তে॥

ঋষির অন্তরের ব্যাকুলতা কী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই ছন্দটিতে : ছুঁড়ো না, ছুঁড়ো না তোমার বাণ এই মৃদু মৃগশিশুর শরীরে—এ যে তুলারাশিতে আগুন দেবার মতো! কোথায় এই হরিণশাবকের অতি কোমল জীবন! আর, কোথায় তোমার বজ্র-কঠিন শরের তূণ!

বাঙলায় স্বরবৃত্তের সাহায্যে মালিনী ছন্দে কবিতা রচনা করা যে সম্ভব, সত্যেন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে গেছেন তাঁর একটি সুপরিচিত কবিতায়—

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্ শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন যৌবনের জীর্ণনির্ভর।
রাগিণী সে আজি মন্থর, উৎসবের কুঞ্জ নির্জন,
ভেঙে দেবে বুঝি অন্তর মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কন।

দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। তবু মন্দাক্রান্তা ছন্দের কথা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা কঠিন। তার সূত্রটি অবশ্য সুবিদিত :

মন্দাক্রান্তা। ম্বুধিরসনগৈ। র্মোভনৌ তৌ গযুগ্মম্।

সে সময়ই প্রথম জানলাম যে, কালিদাসের সমগ্র মেঘদূত কাব্যটি এই ছন্দে রচিত। তারপরে ব্যাকরণের ব্যূহ ভেদ করে এই কাব্য থেকে অনেক রস আস্বাদন করেছিলাম। এখনো মাথায় আমার একটি অতিপ্রিয় শ্লোক প্রোথিত রয়েছে :

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাম্
যে তৎক্ষীরশ্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদিকিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

দেবদারুগাছের কিশলয়পুট সদ্য বিকশিত করে ওখানকার সুরভি বহন করে যে তুষারশীতল বায়ুরাশি দক্ষিণদিকে যাত্রা করেছে, হে গুণবতি, তাদের আমি আলিঙ্গন করছি, যদিই বা যাত্রার প্রাক্কালে তারা তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে এসে থাকে। কান্তার-অঙ্গ-স্পর্শ-করা সমীরণের এই আলিঙ্গনে বিরহী যক্ষের মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে মর্মস্পর্শীরূপে।

সত্যেন্দ্রনাথের মন্দাক্রান্তায় রচিত কবিতার একটি দৃষ্টান্ত সাহিত্যসমাজে বহু লোকেরই পরিচিত :

পিঙ্গল বিহ্বল, ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ
উদয় হও।
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্রমন্থর বচন কও।
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ দাও হে কজ্জল
পাড়াও ঘুম।
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাক্, অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একটি কবিতা সে-সময় আহরণ করেছিলাম, বোধ হয় "সবুজপত্র" থেকে। এক্ষেত্রে কথিত বাঙলার দীর্ঘস্বরগুলোকে সাংস্কৃতিক মূল্য দিয়ে দুই-মাত্রা দেওয়া হয়েছে বলে হাস্যরসের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে :

ইচ্ছা সম্যক্। ভ্রমণগমনে। কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী। মন উড়-উড়ো। একি দৈবেরি শাস্তি॥

কঠিন সংস্কৃত নিয়েও স্বরবৃত্তের কল্যাণে বাঙলায় কত রকম ছন্দের খেলা চলতে পারে, উপরের কয়েকটি দৃষ্টান্তে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

ছন্দের নেশা

আমার স্কুলের পড়ায় কোনো অবহেলা করি নি। তবে বেশ কিছুকাল বাকি সময়ের অধিকাংশই ব্যবহার করেছিলাম ছন্দসংক্রান্ত গবেষণা, আলোচনা ও তথ্যসংগ্রহে। তখন নানারকমের কথা উঠত। নূতন উল্লেখযোগ্য ছন্দোবিষয়ক কোনো তথ্য বা আইডিয়া পেলে তা নিয়ে রসালাপ হত বা পরীক্ষকের মতো তার বিচারে বসে যেতাম।

বড়দা তাঁর স্কুলেও ছন্দ নিয়ে কিছু বলতেন বা পড়াতেন, সম্ভবত বাঙলা ক্লাসে, নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের বাইরে। একদিন বাড়ি এসে তিনি বললেন তাঁর একটি ছাত্রের কৃতিত্বের কথা। অনেক মাথা চুলকিয়ে কাগজে এক লাইন লিখে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যর এটা পয়ার হয়েছে কি?' আর যাই হোক, লাইনটিতে গণিতের ভুল ছিল না :

'গরুগুলি চিবিয়া চিবিয়া ঘাস খায়।'

অনেক হাসাহাসি হল। এ লাইনটি আমার এখনো সুস্পষ্ট মনে রয়েছে একটি অবিস্মরণীয় কারণে। তার বছর বারো পরে আমিও এ-জাতীয় হাস্যোদ্দীপক কাণ্ড করেছিলাম, তবে সেটা পয়ারের চরণ নিয়ে নয়, নিজের চরণ নিয়ে।

১৯৩৪ সনে বন-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি নিয়ে গেলাম কীল-এ (Kiel), ওখানকার একটি নাম-করা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে রিসার্চ করব বলে। যে-বাড়িতে ছিলাম সেখানে দৈবাৎ একটি তরুণ ও চতুর জার্মেন বন্ধু জুটে গেল পিটার গ্রেভে (Peter Greve)। তার নাচবার নেশা ছিল অদম্য, অনেক সময় নিজের ছোটো ঘরেও একা-একাই নাচত। এবার গ্রেভে আমার পিছনে লাগল, আমাকে নাচ অর্থাৎ বলরুম ডানসিং শিখতেই হবে। জীবনে যাই করি না কেন, এই কলা একান্ত প্রয়োজনীয়, সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনেক পীড়াপীড়ির পরে রাজি হলাম। নাচের স্কুলে ভরতি হলাম। জার্মেন বন্ধু নিজেই সব ব্যবস্থা করে দিল। মাস্টার ছিলেন Herr Gemindt নৃত্যবিশারদ হিসেবে সে অঞ্চলে তাঁর নাম ছিল। তিনি মাঝে-মাঝে সস্ত্রীক নাচতেন, নিজের স্কুলে এবং বাইরেও নানা রঙ্গমঞ্চে। এই যুগল দম্পতির নাচ ছিল অপূর্ব, এখনো তাঁদের সেই নাচের দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভাসে। মাস্টারের শেখাবার পদ্ধতি ছিল সহজ আর সুন্দর, তাঁর দৃষ্টিও ছিল তেমনি প্রখর। প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। এই সুদক্ষ, দায়িত্বশীল শিক্ষকের হাতে পড়লে আনাড়ির পক্ষেও নৃত্যবিদ্যা আয়ত্ত না করে পালাবার জো ছিল না। প্রথমেই তিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, দেহের উপরাংশ থাকবে ঋজু, আন্দোলনহীন; নাচতে হবে শুধু পা দিয়ে—তালের সঙ্গে ঠিক মতো পা ফেলে, এবং নাচের নানারকম নকশার অনুকরণ করে। প্রচলিত প্রথা-মতো শুরু করলেন সব থেকে সহজ নাচ, ফক্স ট্রট, দিয়ে। জোরগলায় হাততালি দিয়ে জার্মেন ভাষায় বললেন :

Ein, zwei, drei, vier / Vorwärts gehen!
Fünf, sechs, sieben, acht / Seitwärts gehen!

অর্থাৎ

এক, দুই, তিন, চার / সামনের দিকে যাও!
পাঁচ, ছ', সাত, আট / পাশ দিয়ে চলে যাও!

ডান পা দিয়ে শুরু করতে হবে, চার পা এগোতে হবে সামনের দিকে, তারপর চার পা যেতে হবে পাশ কেটে। আমি বাধ্য ছাত্রের মতো যন্ত্রবৎ তাঁর মন্ত্র অনুসারে পা ফেলে চললাম। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে খপ করে ধরে বললেন, "Herr Doktor, bitte, tanzen! Nicht herumlaufen!" (ডক্টর, নাচতে হবে, ছুটোছুটি করবেন না!)

এমন শিক্ষক এবং উৎসাহী আর নাছোড়বান্দা তরুণ বন্ধুর কল্যাণে শুধু যে নাচ শিখলাম, তাই নয়। তাঁদের কাছ থেকে শেষে অনেক তারিফও পেয়েছিলাম। পিটার গ্রেভের কথায় কত সত্যতা ছিল, তাও পরে বুঝতে পেরেছিলাম। রোমবাসী হলে রোমানের মতোই চলতে হয়। ইয়ুরোপে দীর্ঘকাল

বাস করলে তেমনি নাচ শেখা একান্ত প্রয়োজন। আমার দীর্ঘ ইয়ুরোপ বাসের বেলা তা উপলব্ধি করেছি এবং এ বিদ্যার যথোচিত সদ্ব্যবহারও করেছি।

তবে, বড়দার সঙ্গে যে ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তা যেমন গদ্যকবিতার উগ্র আবির্ভাবের পরে যবনিকার অন্তরালে প্রায় অদৃশ্য হয়েছে, এই নৃত্যকলার বেলাও একই কথা বলা চলে। সেই পুরাতন বলরুম-নৃত্য তার সংযম ও সৌষ্ঠব নিয়ে অন্তর্ধান করেছে। তার স্থান দখল করেছে আধুনিক নৃত্য, অর্থাৎ লম্ফঝম্পবহুল 'রক অ্যানড রোল'!

আমাদের ছন্দচর্চায় যে বেশ কিছুটা নবদ্বীপের তার্কিকদের ছোঁয়াচ লেগেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন, একদিন খেতে বসে বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলাম—

ডালভাত চাট্‌নি
রান্‌তে খাট্‌নি।

এটা কী ছন্দ? আমাদের সিদ্ধান্তও তখুনি ঠিক হয়ে গেল: এটা স্বরবৃত্ত, দ্বিস্বর, পূর্ণ দ্বিপদী। যদি 'রান্‌তে' না বলে 'রন্ধনে' বলা হত, তাহলে সেটা হত মাত্রাবৃত্ত, চতুর্মাত্রিক, অপূর্ণ দ্বিপদী।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যদিও তা অন্য ধরনের—

তৃষিত হইয়া চাহি / এক ঘটি জল,
তাড়াতাড়ি এনে দিল / আধখানা বেল।

এক্ষেত্রে ছন্দটি নিখুঁত পয়ার, চোদ্দ অক্ষরের ছত্র, আট অক্ষরের পরে যতি। তবে খুঁত রয়েছে মিলের বেলা। 'জল' আর 'বেল'—দুই শব্দের শেষে 'ল' রয়েছে সত্য, কিন্তু শুধু তাই দিয়ে তো আর মিল হয় না, তার আগের স্বরবর্ণটি তো বাদ দেওয়া যায় না। তবু এই মিলের অভাবটাই আমাদের খুব মনঃপুত হয়েছিল। কারণ এখানে ধ্বনিতে অমিল থাকলেও অর্থে একটা মস্ত বড়ো মিল রয়েছে। চাইলাম এক জিনিস, পেলাম সম্পূর্ণ অন্য জিনিস—চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে তফাতটা অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে অমিলের মধ্য দিয়ে। তাই এখানে গরমিলের মধ্যেই রয়েছে আসল মিল।

আমাদের বাড়ির অবস্থা তখন অমনি ছিল অনেকটা। ছন্নছাড়া—অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কা এবং অন্তত আপাত দৃষ্টিতে আমাদের অব্যবস্থিত-চিত্ততা। তার উপর রাতদিন ছন্দ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। ফলে, বাড়ির আর সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তখনকার অবস্থা স্মরণ করে একদিন মন্দাক্রান্তায় লিখেছিলাম—

ছন্দের হিল্লোল তুলিল কলরোল, কর্মে বিস্তর বিপর্যয়।
দুই ভাই রাতদিন কেবলই খুঁজে মিল, অধ্যয়ন নেই,
সবার ভয়॥

বাঙালির গর্ব

বাঙলা ভাষায় যে কত বিচিত্র ছন্দে কাব্যরচনা সম্ভব তা দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম, মনে-মনে গর্বও অনুভব করেছিলাম। সংস্কৃতভিত্তিক, স্বরবহুল, যুক্ত-বর্ণেরও প্রাচুর্য, আবার সঙ্গে-সঙ্গে কথিত বাঙলায় স্বরসংকোচনের সুন্দর ব্যবস্থা—তাই এ ভাষায় নানা-ভাবে ছন্দের কেরামতি দেখানো সম্ভব। কেবল ছন্দের দিক দিয়ে বিচার করলে বাঙলা ভাষাকে অদ্বিতীয় বললে অত্যুক্তি হবে না—'এমন ভাষা কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি'! কয়েক বছর পরে সেকথাই বড়দা তাঁর অবিস্মরণীয় ভাষায় অনুপম উপমা দিয়ে বলে গেছেন:

'যে ঐশ্বর্যশালী অহোরাত্র ঐশ্বর্যের হাওয়াতে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়ে ওঠে, সে তার সহজলব্ধ সম্পদের প্রাচুর্য সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। বাংলার মত নদীমাতৃক দেশে যাদের জীবন পরিপুষ্ট তারা বাংলার নদীগুলির মাধুর্য সজাগভাবে অনুভব করে না, কিন্তু অলক্ষে তাদের মধুধারাতেই বাঙালির জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। তেমনি বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেও ছন্দের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন ধারা কেমন করে বাঙালির জীবনকে সরস ও সতেজ করে তুলেছে, রসমুগ্ধ বাঙালি সহজে তা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু যখন চোখ খুলে বিভিন্ন দেশের ছন্দের ক্ষীণ ধারাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন নিজের মাতৃভাষার এই অপূর্ব সম্পদ্ দেখে হৃদয় গৌরবে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন্ ভাষার ছন্দে এমন তিনটি বিশাল ধারা আছে, আর কোন্ ভাষায় এক ধারা থেকে বহু ধারা নির্গত হয়ে সমগ্র কাব্যক্ষেত্রকে এমন শ্যামল ও সুশীতল করে তুলেছে, তা তো জানিনে।'—

এ কথাগুলো বড়দা বলেছিলেন ১৩৩০ সনে, বৈশাখ মাসে "প্রবাসী" পত্রিকায়, তাঁর ধারাবাহিক ছন্দপ্রবন্ধের উপসংহারে। অতকাল পরেও এ মন্তব্যের গুরুত্ব এবং সত্যতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। তবে স্বীকার করতে হবে যে, তার মধ্যেও রয়েছে দুইটি অদৃষ্টের পরিহাস। আমরা আমাদের নদীসম্পদ ও ছন্দসম্পদ দুটোকেই নির্বিকারভাবে অবহেলা করে চলেছি। নদীমাতৃক দেশের সন্তান হয়েও আমরা বঙ্গমাতার গুণ-গান করি শুধু মুখে-কথায়, কাব্যে, গানে—কার্যত নয়। তাই উপেক্ষিত নদীগুলো প্রতিশোধ নেয় কখনো বর্ষার দুরন্ত প্লাবনে, আবার কখনো অনাবৃষ্টি, জলাভাব আর নিদারুণ খরায়। এই নদীগুলোকেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করলে আমরা যে বঙ্গমাতাকে ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে বিভূষিত করতে পারি, সে সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য আজো পর্বতপ্রমাণ।

ছন্দের বেলাও একই কথা বলা চলে। তফাত শুধু এই যে, অন্তত অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙলা ছন্দ আমাদের কাব্যসাহিত্যকে কী পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে, তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, উপভোগ করেছি। তারপর রবীন্দ্রোত্তর যুগে কোথা থেকে এসে হাজির হল এক দুর্দমনীয় ছন্দোবিমুখতা। এখন চলেছে গদ্যপদ্যের জোয়ার। ফলে বাঙলা ছন্দের তিনটি বিশালধারাই আজ বিশুষ্ক, মৃতপ্রায়। সেখানে দেখা দিয়েছে এক প্রচণ্ড খরা।

খ্যাতনামা ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের অবদান সম্পর্কে স্মৃতিচারণের ঢঙে এই লেখাটি প্রকাশের অপেক্ষায় চতুরঙ্গে জমা থাকা অবস্থায় লেখক ড. সুধীর সেনের মৃত্যু হয়। বিষয়টি ইতিপূর্বে "চতুরঙ্গ" পাঠকদের গোচরে আনা হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেনের অনুজ হওয়ার কারণে নিবন্ধের সর্বত্রই লেখক তাঁকে 'বড়দা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

সম্পাদক

রেবতীমোহনের একটুকরো মাটি

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ে লালচে-খয়েরির রঙমশাল। বাড়ির পেছনে রেবতীমোহনের একটুকরো বাগান। মুসানডার ঝাড় সারি-সারি লম্বা করে লাগানো। একটা আরামকেদারায় রেবতীমোহন বসেন। আজকে না-শীত, না-গরম। আবহাওয়াটা বেশ আরামদায়ক। গোধূলি-বিকেলের নরম হাওয়ায় দুলছে অপরাজিতা, দুলছে নয়নতারা। রেবতীমোহনের এই একটুকরো মাটি। রেবতীমোহনের বুকের মধ্যে এই একটুকরো সুখ। উঠোন পেরিয়ে কমলা এলেন। হাতের কাপে কফি। বাঁহাতে রেবতীমোহনের ধপধপে সাদা চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে কমলা ডানহাতের কফিকাপটা এগিয়ে দেয় রেবতীমোহনের হাতে।

'এবার জান, কমলা, একটা নয়নমণি আনব।'—রেবতীমোহন পেছন না ফিরেই বললেন।

কমলা ছোট্ট উত্তর দেন, 'এনো, তবে বুড়ো বয়সে আর এত হ্যাপা নেওয়া কেন?'

'নয়নমণি অপূর্বদর্শন ফুল। এদের ফুল ফোটে এক অদ্ভুত ধরনের থোকায়। ছটা থেকে দশটা ফুল একসঙ্গে ফুটে থাকে। ফুলগুলো ঘন লাল, আর লালের ভেতর ঘন কালো।'

'দুটো বিপরীতধর্মী রঙের বাহার'—কমলা হেসে বলেন।

'কিন্তু তুমি জান না, কমলা, এদের সমাবেশ কী অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।'—বলেই রেবতীমোহন কমলাকে দেখেন।

কমলা বললেন, 'আজকের হাওয়াটা বড্ড জোলো। বেশিক্ষণ বাইরে বোসো না। ভেতরে এসো।

রেবতীমোহন আস্তে-আস্তে ভেতরের দিকে পা বাড়ান। এইটি রেবতীমোহনের বাড়ি। অনেক খুঁজে-পেতে মফস্‌সল শহরের এই নির্জন জায়গাটা পছন্দ করেছিলেন রেবতীমোহন। রিটায়ারমেনটের পর জমানো টাকায় এখন তাঁর দু-কামরার এই একটা বাড়ি। মনের মতন করে যতটা সামর্থ্যে কুলোয় ততটা মেপে শৌখিন করে গড়ে তোলা এই বাড়ি। দুটো ঘর, একটা ডাইনিং স্পেস। সামনে লবি। বাথরুম, পায়খানা। আর পেছনে রেবতীমোহনের সেই একটুকরো মাটি—বাগান। রেবতীমোহনের শখের একটুকরো বাগান।

রেবতীমোহনের দুই ছেলে। বড়ো ছেলে অনু আমেরিকায় গবেষণা করে। ছোটো ছেলে জয় সরকারি অফিসার, দিল্লিতে থাকে। এখন বাড়িতে মাত্র দুজন। রেবতীমোহন আর তাঁর স্ত্রী কমলা।

বাগান থেকে ঘরে এসে রেবতীমোহন ডাকলেন, 'কমলা, একবার ঘরে এসো।'

কমলা ঘরে এলেন। দেখলেন, রেবতীমোহন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছবিটার দিকে। কমলা নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়ালেন। ছবিটাতে একটা চেয়ারে বসে জয়, পেছনে অনু।

রেবতীমোহন পেছন ফিরে তাকালেন কমলার দিকে। বললেন, 'ছবিটা বড়ো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বোধহয় পুরোনো হয়ে যাচ্ছে বলেই।'

কমলা ঘাড় নাড়লেন, বললেন, 'বোধ হয় তাই।'

'কাল যখন বাজারে যাব মনে করিয়ে দিও। বাঁধাইটা পাল্টে, কাঁচ পাল্টে, নতুন ফ্রেমে নতুন বাঁধাই লাগাব।'

কমলা ঘাড় নেড়ে বাইরে যাচ্ছিলেন।

'দাঁড়াও না কমলা, কোথায় যাচ্ছ?' রেবতীমোহন ধীরে-ধীরে কমলার কাছে আসেন। তারপর বলেন, 'তোমার মনে আছে, ছেলেবেলায় জয়ের খুব শখ ছিল একটা সুন্দর ছিমছাম বাড়ির। আর ব্যালকনিতে থাকবে নানান ধরনের অর্কিড।'

'অর্কিডের শখ ছিল জয়ের। আর অনুর ছিল গাড়ির শখ।'—কমলা বেশ উৎসাহ নিয়ে বললেন।

'দেখো কমলা, তুমি যাই মনে কর—অনুটা ছিল বড্ড বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু জয়ের ছিল সৌন্দর্য-প্রীতি।'

'মোটেই তা নয়। তুমি অনুকে বুঝতেই চাও নি তেমন করে কোনোদিন। অনু চিরকালই স্বাধীনচেতা।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' ধীরে-ধীরে ঘাড় নাড়তে-নাড়তে রেবতীমোহন চেয়ারে বসেন। বলেন, 'অনু আমেরিকায় গেছে কতদিন বলো তো?'

'তা বছর তিনেক'—কমলা বললেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেবতীমোহন বললেন, 'অনুর কথা কী বলব? জয় তো থাকে এদেশেই, দিল্লিতে। তাও তো গেল পুজোয় এল না। তা প্রায় বছর দেড়েক ওদের দেখা নেই। নাতিটা যে কেমন আছে সে খবরটাও দেয় না আজকাল।'

'চার মাসেও চিঠি আসে না। বাবা, মা একলা আছে। কী জানি কী যে ভাবে ওরা।' কমলা গম্ভীর গলায় বলেন।

কমলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। রেবতীমোহন ভারী আলোর টিউব-ল্যাম্পটা নিভিয়ে দেন। তারপর রঙিন আলোর নাইট-ল্যাম্পটা জ্বালেন।

জানালাটা খুলতেই একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। সামনের মাঠটায় সবে সন্ধে নেমেছে। ছেলে-মেয়ের দল একটু আগেই খেলছিল। এখন নেই। দু-চারজন কেবল ঘোরাঘুরি করছে।

রেবতীমোহন হেঁটেছেন সারাটা জীবন ধরে, একটুকরো মাটির খোঁজে। সেই ছেলেবেলায় কবে যে বাবা মারা গেছেন—রেবতীমোহনের খেয়ালই নেই। কাকা-জ্যাঠার সংসারে রেবতীমোহন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে একটু-একটু করে বড়ো হয়েছেন। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর বেশ কিছুদিন বেকার থেকেছেন। দেখেছেন তাঁর প্রতি বাড়ির গুরুজনদের নিদারুণ আস্থাহীনতা আর মায়ের মুখে হতাশা। এমনি করেই হঠাৎ একটা চাকরি জুটে গেল কপালে। তারপর কমলা ঘরে এল। অনু হল, জয় হল।

কমলা ঘরে এলেন। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় রেবতীমোহন দেখলেন সিঁদুরে রাঙানো সিঁথির চারপাশে অজস্র সাদা চুলের ভিড়। কমলার মুখে আজ একটা অস্বস্তির ভাব। কমলা যেন কিছু বলতে

চান।

'কিছু বলবে, কমলা?'—রেবতীমোহন জিজ্ঞেস করেন।

'চলো না এবার পুজোয় দিল্লিতে বেড়াতে যাই। জয়ের কাছে।'

'এই বাড়ি ফেলে রেখে?'—রেবতীমোহন অবাক হন।

'রাখলেই বা কাউকে, রাতটুকু থাকতে দিলেই হল। আর কীই বা এমন জিনিস আছে তোমার ঘরে।'

রেবতীমোহন হাসলেন। বললেন 'দেখি।' তারপর বললেন, 'কাছে এসো না কমলা।'

কমলার হাত ধরে মৃদু টান দিতেই সে আরাম-কেদারায় বসা রেবতীমোহনের একেবারে কাছে। ঘরের আলো-আঁধারি রেশে কমলার বয়স্ক মুখখানাকে মনে হল গোধূলির ম্লান সূর্য। জানালার পাশ থেকে গাছে ফুটে থাকা চাঁপাফুলের গন্ধ আসছিল। রেবতীমোহন জোর করে কমলাকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'কমলা, আজ কিন্তু তোমাকে বড্ড ভালো লাগছে।'

কমলা হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। রেবতী-মোহন কোনো কথা না বলে কমলার পিঠে মৃদু হাত বুলোতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর কমলা বললেন, 'আমার বড্ড একলা লাগে গো—বড্ড একলা লাগে।'

ইদানীং রেবতীমোহন রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে চা-টা খেয়ে চলে যান বাগানে। বাগানটা ঘুরে-ঘুরে দেখেন প্রথমে তিনি। মরশুমি ফুল ফুটে থাকে বাগানের চার-দিকে থোকায়-থোকায়। মনটা ভরে ওঠে তাঁর সে সময়। তাঁর পরিশ্রমের, ইচ্ছার নির্যাস যেন এই বাগানটার সারাটা শরীরে। এবারে একটা নয়নমণি লাগাবেন ঠিক করেছেন রেবতীমোহন। ফুলগুলো ঘন লাল। আর লালের ভেতর ঘন-কালো। বাগানে বসে খানিকক্ষণ পরিচর্চা করেন। তারপর বাজারে যান।

কমলা ওঠেন। স্নান করেন। ফুল তুলে পুজোয় বসেন। তারপর রান্নাঘরে যান। কমলা যখন গরদ পরে বাগানে ফুল তোলেন, রেবতীমোহন তখন দু চোখ ভরে দেখেন।

সেই প্রথম বিয়ে হয়ে কমলা যখন ঘরে এলেন, রেবতীমোহনের তখন সহায়সম্বলহীন অবস্থা। চাকরি-টুকুই ভরসা। রূপসী ছিলেন বটে কমলা। তারপর তো দুজনে মিলে পথ হাঁটতে-হাঁটতে কতরকমের হোঁচট খেতে-খেতে আজকে এইখানে এসে পৌঁছেছেন।

ওঁদের দুই ছেলে অনু আর জয়। সেই ছেলেবেলার অনু আর জয়। এখনও চোখে ভাসে রেবতীমোহনের। কী মিল ছিল দু ভাইয়ে। একসঙ্গে পড়তে বসত, একসঙ্গে খেত, একসঙ্গে স্কুলে যেত, একসঙ্গে শুত। অনু জয়ের থেকে দু বছরের বড়ো। অনুর প্রিয় ছিল বিজ্ঞানের নানা মডেল তৈরি করা। জয়ের প্রিয় ছিল আঁকা এবং বাগানে নানান ফুলের গাছ তৈরি করা। জয়ের স্বভাবটাই রেবতীমোহনকে টানত বেশি। অনুকে দেখে মাঝে-মাঝে ভয় হত রেবতীমোহনের। তিনি বেশ বুঝতে পারতেন যে অনুকে কাছে ধরে রাখা যাবে না।

রেবতীমোহনের অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু স্বপ্ন-গুলো মোটেই তেমন বৈষয়িক নয়। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার ফল যেদিন বেরোত, সেদিন বাড়িতে বেশ হৈ-চৈ হত। রেবতীমোহন সেদিন বিশেষ একটু-আধটু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। কমলা সারা-দিন খুশিমনে ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করতেন। এ-বাড়ি ও-বাড়িতে খবর পৌঁছে দিতেন। তারপর সন্ধেবেলায় তিন বাপ বেটা মায়ে মিলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করত। অনু বলত, 'আমি একটা গাড়ি কিনবই; দেখিস জয়।'

জয় বলত, 'জান বাবা, আমার খুব ইচ্ছে একটা সুন্দর ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি হবে। পেছনে ফুলের

বাগান। সামনে একটা ব্যালকনি। ব্যালকনিতে সার-সার ক্যাকটাস। আর রেবতীমোহন ঠিক তখনই স্বপ্নের একটুকরো মাটি দেখতে পেতেন মনের আয়নায়। একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়ি। সামনের ব্যালকনিতে নানান ধরনের ক্যাকটাস। অনু বড়ো হয়েছে, জয় বড়ো হয়েছে। ওরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পক্বকেশ রেবতীমোহন দু চোখ ভরে দেখছেন কলার লাল সিথি'র দু-পাশে সাদা-কালোর বৈপরীত্য।

অনেক বছর কেটে গেছে। অনু আমেরিকা গেছে বিজ্ঞানের গবেষণায়। বলেছে ওদেশে কাজ করার সুযোগ অনেক বেশি। ও আরও অনেক দূর অবধি বিজ্ঞানকে জানতে চায়। দেশে হয়তো নাও ফিরতে পারে।

জয় অনেক বেশি পরিণত হয়েছে। সে সরকারি অফিসার। থাকে দিল্লিতে।

অনু বিয়ে করে নি এখনও। জয়ের বিয়ে দিয়েছেন রেবতীমোহন। জয় চিঠি লিখেছে 'বাবা, সবকিছুই চলছে মোটামুটি। কিন্তু চলছে না কেবল শিল্পের চর্চাটুকু। মাঝে-মাঝে ভেতরে-ভেতরে একটা ভীষণ কষ্ট হয়। ভাবছি এবার ওটা নিয়ে নতুন করে একটু ভাবব। যেমন করেই হোক, কিছুটা সময় যদি করে নিতে পারি।'

গত রাত্রে ভাবনাটা রেবতীমোহনকে বড়ো বেশি ভাবিয়েছে। অনেক বেশি পুড়িয়েছে। কাল সন্ধেয় কমলার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্নাটা বড়ো ভাবিয়েছে রেবতীমোহনকে। কমলা অনেকদিন এভাবে কাঁদেন নি। বড়ো একলা লাগে কমলার। রেবতীমোহন বুঝতে পারেন। নিস্তব্ধ নিঝুম এই বাড়িটায় শুধুই ছুটে শেষ বিকেলের মানুষ। শুধুই স্মৃতি আর প্রতীক্ষা নিয়ে ঘোরাফেরা। হঠাৎ মনে পড়ে যায় জয়ের সেই আবৃত্তির কথা।

ভোর; আকাশের রঙ ঘাসফড়িং-এর দেহের মতো কোমল নীল :'

জয় বলেছিল 'বাবা, এ মাসে মাইনে পেলে একটা জীবনানন্দ কিনে আনবে?'

মাসমাইনের কথাটা মনে পড়ল রেবতীমোহনের। ওই দিনগুলো ছিল যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতির দিন। সারাটা মাস ধরে জমিয়ে রাখা টুকরো-টুকরো চাওয়ার সেদিনটা ছিল মোক্ষলাভের দিন। অনুর চারটে টেস্ট-টিউব কিংবা একটা স্লাইড ক্যালিপার। অবশ্য যদি পাওয়া যায়। জয়ের অবনীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দ। কমলার চুলের হাড়ের কাঁটা, কিংবা ড্রেসিং টেবিলের পুরানো কাঁচের আয়নাটা বাদ দিয়ে একটা নতুন আয়না। অথবা বহুদিনের শখ প্লাস্টিকের রঙচঙে একটা ম্যাট। যদিও সব মাসে সবকিছু হত না। তবুও অফিসফেরতা রেবতীমোহন কিছু-কিছু সঙ্গে নিয়ে আসতেন। আর প্রথমদিনেই বরাদ্দ ছিল একটু ভালো অন্যরকম খাওয়া দাওয়া। সেদিন ঘরে ঢুকেই টের পেতেন কমলার গা দিয়ে একটা সুবাস বেরোচ্ছে। রেবতীমোহনের খুব ভালো লাগত। কিন্তু মুখে কিছুই বলতেন না।

রেবতীমোহনের এই অভ্যেস। খুব ভোরে ওঠা। বাগানে পায়চারি করা। নিজের হাতে একটা-একটা করে গাছ পুঁতেছেন রেবতীমোহন। অপরাজিতা, নয়নতারা দুলছে। ভোরের আলো এখন বেশ স্পষ্ট মৃদু ও মনোরম। চাঁপার গন্ধ ভাসছে। বোগেনভেলিয়া মুসানডার ঝাড়ের প্রত্যেকটা ফাঁকফোকর হয়ে চার-পাশে। এখানে দাঁড়ালে এক অদ্ভুত সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করেন রেবতীমোহন। তিনি দেখছেন দোপাটির চারাগুলো বেশ শক্ত-সমর্থ হয়েছে। একসময় তাঁর হাতের পরিচর্চা পেয়ে গাছগুলো বেশ সমৃদ্ধ হবে। তারপর ফুলে-ফলে রঙিন হয়ে হাসবে আকাশের পানে চেয়ে। মরশুমি ফুল রেবতীমোহনকে টানে বেশি। রেবতীমোহন অনেকক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে থাকেন আর ভাবেন মরশুমি ফুলগুলির বাড়বৃদ্ধি, ফুলে-ফুলে চোখাচোখি, হাসাহাসি। সব শেষ হয়ে যায় কিছুদিন পর। মরশুম পেরিয়ে যায়। ফুল কমতে থাকে। একসময় গাছগুলো বড়ো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

কেমন যেন সহায়সম্বলহীন হয়ে এই বুড়ো গাছগুলো শেষ দিনটার জন্য অপেক্ষা করে। রেবতীমোহনের বড্ড মায়া এই গাছগুলির প্রতি। কখনও জঞ্জাল মনে করে উপড়ে ফেলেন না। যখন গাছগুলো শুকিয়ে যায়, তখন খুব যত্ন করে তুলে বাগানের এক-জায়গায় জড়ো করে রাখেন।

কখন যেন বেশ রোদ উঠে গেছে। হঠাৎ একটু জোরে হাওয়া বইছিল এতক্ষণ। প্রত্যেকটা গাছ দুলছিল। আজকাল রেবতীমোহন গাছেদের দোলা থেকে হাওয়ায় মেশামেশি হয়ে একরকম শিরশিরে শব্দ শুনতে পান। তিনি যেন কিসের একটা ইঙ্গিত পান। দূর আকাশের দিকে চাইলেন রেবতীমোহন। ঘন-নীল পরিষ্কার আকাশ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু পাখির আকাশের বিশাল প্রান্তরে ডানা মেলে ওড়া।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে রেবতীমোহনের মনে হল আকাশের নীচে তাঁর একটুকরো মাটি। বহু-আকাঙ্ক্ষিত এবং জীবনের বহু-প্রতীক্ষিত এই এক-টুকরো মাটি। চারপাশে মরশুমি ফুলের গাছ, মরশুমি মানুষের গাছ। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো বিশেষ গাছের জন্য তাঁর সুখ অনুভব হচ্ছে না, আবার দুঃখ-বোধও হচ্ছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে রেবতীমোহনের মনে হচ্ছে তিনি যেন তাঁর বাগানের একটা গাছ হয়ে গেছেন। গাছগুলোর দুলুনিতে একটা শিরশিরে শব্দ উঠল। রেবতীমোহন শুনতে পান কিসের যেন একটা ইশারা। হঠাৎ মনে হল, তাঁর শরীরটা অনেক ভারী হয়ে গেছে। ভারী শরীরটা ধীরে-ধীরে বসে যাচ্ছে মাটির একেবারে ভেতরে। হঠাৎ মনে হল—সমস্ত গাছের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমগ্র বাগানটাই দুলছে। রেবতীমোহন বসে পড়ে দু-হাতে আঁকড়ে ধরেন মাটি। অনেকক্ষণ ধরে কমলার ডাকাডাকিতে সম্বিত -ফিরে পান তিনি। কমলার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে ঘরে আসেন।

'তোমার শরীরটা খারাপ। থাক, আজ আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই। ঘরেতে যা আছে, তাই দিয়েই চালিয়ে নেব।'—কথাটা বলতে-বলতে কমলা রেবতীমোহনকে খাটের বিছানায় শুইয়ে দেন।

রেবতীমোহন কোনো কথা বলেন না। একটু পরে একগ্লাস দুধ নিয়ে ঘরে ঢোকেন কমলা। রেবতীমোহনের হাতে দেন।

'কী হয়েছিল?'—জিজ্ঞেস করেন কমলা। আলতো ঘাড় নেড়ে রেবতীমোহন বলেন, 'কিছু না'। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা কমলা, কোনদিন ভোরের আকাশ দেখেছ তেমন করে? অথবা মাটির রঙ?'

চুপ করে থাকেন কমলা।

'কমলা কাল সন্ধেয় তুমি কাঁদছিলে না? তোমার সবকিছু থেকেও তুমি কত একলা—এই ভেবে?'

কমলা চুপচাপ। চোখে চিকচিক করছে জল।

'এইরকম অবস্থায় আছ বলেই, নির্জনতা আজ তোমার কাছে বড়ো বেশি নগ্ন। আর সেইজন্যেই এই তো সময়। আকাশকে দেখো, গাছকে চেনো। মাটির গন্ধকে অনুভব করো। এদের সবসময় তুমি পাবে।'

কমলার চোখে জল। দুহাতে রেবতীমোহনের মুখটা চেপে ধরেন। তারপর ধরা গলায় বলেন, 'জীবনের এই শেষবেলায় আবার নতুন করে এইসব চিনতে হবে?'

রেবতীমোহন মনে-মনে ভাবেন,—কমলা বোঝবার চেষ্টাই করে না যে সময়টাই তো সবসময় নতুন। যে আলোটা দেখছি সেটাও নতুন। যে অন্ধকার সেটাও তো নতুন।

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রেবতীমোহন খাটে শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে। হঠাৎ দেখলেন ডাকপিয়ন নামল সাইকেল থেকে। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে সদর দরজার কাছে। এরই জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন রেবতীমোহন। এখন বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনা। চিঠিটা নিয়েই ঘরে এসে খুললেন। এখন নিস্তব্ধ নিঝুম দুপুর। পাশের ঘরে

কমলা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে ডাকপিয়ন চলে গেল। চিঠিখানা পড়া শেষ করেই রেবতীমোহন এখন কেমন যেন নিস্পন্দ। চিঠিটা এসেছে আমেরিকা থেকে। অনু লিখেছে। রেবতীমোহনের বুকের মধ্যে এখন যেন কাড়া-নাকাড়া বাজছে। কাঁপা-কাঁপা হাতে চিঠিখানা বন্ধ করেন ভাঁজে-ভাঁজে ফেলে। তারপর ধীরে-ধীরে পাশের ঘরে। কমলা বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আস্তে-আস্তে রেবতীমোহন খাটে কমলার কাছে বসেন। খাটের শব্দে বসার নড়াচড়ায় কমলার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে রেবতীমোহনকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসেন।

চোখ মেলে রেবতীমোহনকে দেখে কমলা জিজ্ঞেস করেন, 'শরীরটা এখন কেমন আছে?'

রেবতীমোহন ঘাড় নেড়ে জানায়—'ভালো।' তারপর বললেন 'চলো না কমলা, কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায়?'—কমলা নড়েচড়ে বসেন।

'যেখানে হোক। ধরো পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রে।'

'বাড়িটা এমনি ফেলে রেখে?'

'এই যে তুমি বললে। কাউকে ভার দিয়ে। অন্ততপক্ষে রাতটুকুর জন্যে।'

'তোমার বাগান?'

'এসব ঠিক থাকবে। ওরাও কটা দিন নিজেদের মতন করে বাঁচুক। আর আমরাও……।

কমলা হেসে ফেলেন। বলেন, 'কী হল তোমার? তুমিই তো ছেড়ে যেতে চাও না এ বাড়ি।'

'তুমিই ঠিকই বলেছ। এ বাড়ির এই মাটিটুকুর টান আমায় বড়ো বেশি বিব্রত করে।'

'ভালোই তো। ওটা তোমায় নতুন করে বাঁচার স্বাদ এনে দেয়।'

'না। না। কমলা! অনু ঠিক কাজই করেছে। ও সব বাঁধন ছিঁড়ে নিজের কাজে ছুটে গেছে। জান কমলা, অনু চিঠি দিয়েছে।'

'অনু চিঠি দিয়েছে? এতক্ষণ বল নি তো?'

'জান, অনু আমেরিকায় নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। ও ওখানে বিয়ে করেছে।'—রেবতীমোহন ভেতর-ভেতর হাঁফিয়ে উঠেছেন।

কমলা অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলল, 'অনু বিয়ে করেছে?'

'তা করবে না। ওদেশের মেয়ে বিয়ে করলে তবেই নাগরিকত্ব পাওয়া সহজ হয়।'

কমলা চুপচাপ। চোখদুটো বাষ্পোচ্ছ্বাসে ঝাপসা। ভেতরের আবেগটা বেরিয়ে আসছে প্রবলবেগে বন্যার মতো। তারপর থেমে-থেমে ধরা গলায় বললেন, 'খবরটা মাকেও আগে দিতে পারল না অনু।'

'এই বোধ হয় ভালো হল কমলা। দেখবে ও ভবিষ্যতে অনেক বড়ো হবে। অনেক কাজ করবে। যা তুমি-আমি হয়তো ভাবতেই পারি না এখন।'

কমলা বালিশে মুখ লুকিয়ে এখন ডুকরে-ডুকরে কাঁদছেন।

রেবতীমোহন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর ঘর ছাড়িয়ে বারান্দা, বারান্দা ছাড়িয়ে বাগানে এসে স্থির হন। বাগানে সার-সার ফুলের গাছ। থোকায়-থোকায় রঙ-বেরঙ। মাধবীলতা গাছটার নীচে এসে তিনি দাঁড়ান। দূরে বোগেন-ভেলিয়ার ঝাড়ে রঙের মেলা।

ঘরেতে কমলা মুখ লুকিয়ে চুপচাপ স্থাণুবৎ। পশ্চিমের সূর্য তখনও অস্ত যায় নি। ঘরেতে ছায়া-ছায়া-আবছায়া। রেবতীমোহন ঘরে ঢোকেন। হাতের আঁজলায় একরাশ ফুলের নানা রঙের মেলা। পাঁচমিশেলি মিঠে সুবাস।

রেবতীমোহন ডাকেন, 'কমলা, এদিকে তাকাও।'

কমলা মুখ তোলেন। রেবতীমোহন হাত উঁচু করে নাকে ঠেকিয়ে গন্ধ নেন প্রাণ ভরে। তারপর বলেন, 'হাত পাতো কমলা।'

কমলা বলেন, 'কেন?'

'পাতোই না'—রেবতীমোহন এগিয়ে আসেন কমলার কাছে।

কমলা হাত পাতেন। রেবতীমোহন কমলার দুহাতের আঁজলায় ফুলগুলো ঢালেন। বলেন, 'কমলা, ফুল সবাইকে দিয়ে আনন্দ পেতে হয়।'

কমলা কোনো জবাব দিলেন না। একটু ম্লান হাসলেন কেবল।

রেবতীমোহন বললেন, 'কমলা, দুঃখ কোরো না। যে গাছগুলো থেকে এই ফুলগুলো পেড়েছি, তারাও দুঃখ করে নি।'

ধীরে-ধীরে রেবতীমোহন জানালার ধারে এলেন। দেখলেন পশ্চিমের লাল গাঢ় সূর্যটার নীচে নরম গোধূলির আলো।

ক্রিয়াপদের বানান

নিত্য অতীত কাল
ধাতুর উত্তর ল-বিভক্তি লাগবে
('লো' নয়)

১. প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন ক রে ছি ল সত্তার নূতন আবির্ভাবে।
২. সকল বেলা কাটিয়া গে ল, বিকাল নাহি যায়।
৩. কালের হাতে র ই ল বলে করব না অহংকার।
৪. স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে ; জাগার বেলা হ ল।
৫. সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
   প ড় ল এসে সজীব বর্তমানে।

নেহরু, নরেন্দ্র দেও ও জাতীয় বাম-বিকল্পের পরিণতি

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

এ বছর ভারতের তিনজন শীর্ষস্থানীয় বামমতাদর্শী জাতীয় নেতার জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। এঁদের প্রত্যেকের জীবনের কর্মকাণ্ড আর মতাদর্শ জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থী ধারাকে গতিদান করেছিল। এঁরা হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪), আচার্য নরেন্দ্র দেও (১৮৮৯-১৯৫৬) এবং মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)। গোড়াতেই বলে রাখি, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্‌ফর আহমদ বাম-রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র স্রোতের প্রতিভূ ছিলেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ রূপে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনা করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে নেহরু আর নরেন্দ্র দেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী প্রক্রিয়া সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তাই বাম রাজনীতিতে তাঁরা ছিলেন একপঙক্তিভুক্ত। তথাপি তাঁদের আচার-আচরণ আর কর্মপন্থার ফারাক কিভাবে ভারতের বাম-বিকল্পকে ভিন্ন খাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু।

স্থান, কাল আর লক্ষ্য—এই তিন দিক দিয়েই নেহরু আর নরেন্দ্র দেওয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের জন্মের সময়ের ব্যবধান ছিল দু সপ্তাহের—নরেন্দ্র দেও ১৮৮৯ সালের ৩১শে অকটোবর জন্মগ্রহণ করেন, আর মোতিলাল নেহরুর একমাত্র পুত্র জওহরলালের জন্মতারিখ ১৪ই নভেমবর। নেহরু আর আচার্য নরেন্দ্র দেও দুজনেই ছিলেন উত্তর প্রদেশের মানুষ, তাই স্বাভাবিকভাবে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি ছিল দুজনের কার্যকলাপের উৎসমূল। এখান থেকেই তাঁরা শক্তি আর সংগ্রামের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সংগঠন ও কৃষক আন্দোলন তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং গণ-রাজনীতির ভিত্তি ছিল। লক্ষ্যের দিক দিয়েও তাঁরা একই স্রোতে অবগাহন করেছিলেন। দুজনেই কংগ্রেস রাজনীতির

মূল স্রোতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তাঁরা চলতে চান নি। তাঁদের কাছে কংগ্রেস কোনো নিছক রাজনৈতিক দল ছিল না, তাঁদের কাছে কংগ্রেস ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি গণ-প্রতিষ্ঠান। জাতীয় মুক্তি এবং অর্থনৈতিক শোষণের অবসান অর্থাৎ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কংগ্রেসকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন।

কিন্তু নেহরু আর নরেন্দ্র দেও ছিলেন দুই স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলের মানুষ। তাঁদের সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উৎস ছিল বিভিন্ন। মোতিলাল নেহরুর পুত্র জওহরলাল বিলাসব্যসন আর বৈভবে মানুষ হয়েছিলেন এবং বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেদেশেই তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তী কালে সোভিয়েত রাশিয়া পরিভ্রমণ করে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিশের দশকে "সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগ" নামক সংগঠনের সঙ্গেও নেহরুর যোগসূত্র ছিল। পক্ষান্তরে, নরেন্দ্র দেওয়ের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা দেশজ অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে উঠে এসেছিল। গ্রামীণ কৃষকের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এ ছাড়া, শিক্ষাবিদ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ছাত্র- যুব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ তিনি পান। বেনারসের সুবিখ্যাত কাশী বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নরেন্দ্র দেও। কাশী বিদ্যাপীঠ অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় সংগ্রামের একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এখানকার ছাত্র ছিলেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ভগবানদাসের অবসর গ্রহণের পর নরেন্দ্র দেও কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হন এবং "আচার্য" নামে পরিচিত হন।

এদিকে বিশের দশকের শেষ দিক থেকে কংগ্রেস রাজনীতিতে বামপন্থী ও প্রগতিশীল প্রবণতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ তরুণ নেতারা যুবসমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রচার করতে লাগলেন, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও স্ফীতি দেখা দেয়। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জাতীয় আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এর অঙ্গীভূত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের অবসানের পর জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে শূন্যতা আর অবসাদের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে এম. এ. আনসারি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ নেতারা কংগ্রেস-কর্তৃক সংসদীয় কর্মসূচী অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা গান্ধীজীর সমর্থন লাভ করেন। অন্যদিকে ১৯৩৩ সালে নাসিক জেলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ কংগ্রেস নেতারা কংগ্রেসকে একটি সংগ্রামী সংগঠনে পরিণত করার জন্য একটি বামপন্থী গোষ্ঠী গঠনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, ইউসুফ মেহের আলি, এন. জি. গোরে প্রমুখ। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ১৯৩৪ সালের মে মাসে তাঁরা পাটনায় এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। এই সর্বভারতীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আচার্য নরেন্দ্র দেও। সভাপতির ভাষণে তিনি কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির কঠোর সমালোচনা করলেন এবং শ্রমিক, কৃষক, আর মধ্যশ্রেণীর মানুষকে সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানালেন। এরপর বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের পাশাপাশি নিখিল ভারত সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে (অকটোবর ১৯৩৪) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। সম্মেলনে অনুমোদিত প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে কংগ্রেসকে শক্তিশালী গণসংগঠনে পরিণত করার কথা বলা হয়। নতুন দলের সভাপতি হলেন আচার্য নরেন্দ্র দেও, সাধারণ সম্পাদক হলেন জয়প্রকাশ নারায়ন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়নের জন্য কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় নি। এর কারণ দেখিয়ে আচার্য বলেছিলেন—কংগ্রেস জাতীয় সংগ্রামের মূল মঞ্চ; এর থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ জাতীয় সংগ্রামকে দুর্বল করে তোলা; তাঁদের মূল কর্তব্য হল জাতীয় স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যটিকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। এর জন্য তাঁরা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে কোণঠাসা করে কংগ্রেসকে একটি প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান। নরেন্দ্র দেও সক্ষোভে মন্তব্য করেছিলেন যে, গান্ধীবাদ 'কায়েমি স্বার্থ আর ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীদের' মুখোশ হয়ে উঠেছে। তাই দেশবাসীর স্বার্থে কংগ্রেসকে গতিশীল ও গণমুখী করে তুলতে হবে।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠার পর নরেন্দ্র দেও আর তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী গোষ্ঠী আর কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য মতবিরোধ শুরু হয়। কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত করতে চান নি এবং তাঁরা কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি সুনজরে দেখেন নি। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নিবিড় সম্পর্ক অব্যাহত রাখার বিরোধী ছিলেন। এ ছাড়া, তাঁরা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের প্রকৃত-সমাজতান্ত্রিক দল বলে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কংগ্রেসের বামপন্থী ঝোঁক উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এর মূলে যে দুজনের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁরা হলেন নরেন্দ্র দেও আর জওহরলাল। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনের কার্যকলাপে দুজনের অভিন্ন ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন পড়েছিল। সৌভাগ্যের কথা, ১৯৩৫ সালে আচার্য নরেন্দ্র দেও উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। অন্যদিকে ১৯৩৬ সালে নেহরু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হন। ব্যক্তিগতভাবে এবং মতাদর্শের দিক দিয়ে নেহরুর সঙ্গে নরেন্দ্র দেওয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নেহরু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য না হয়েও ওই দলের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে নেহরু যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন তাতে নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ ও অচ্যুত পটবর্ধন—এই তিনজন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি নেহরুর আকর্ষণ আর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতি তাঁর অনুরাগ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মনঃপূত ছিল না। বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতারা ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দেন। অবশ্য গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে (জুলাই, ১৯৩৬)।

এদিকে বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় মন্ত্রিত্বগ্রহণের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। নেহরু আর নরেন্দ্র দেও দুজনেই মন্ত্রিত্বগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল—এর ফলে কংগ্রেস গণ-সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সংসদীয় কার্যকলাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। অবশ্য গান্ধীজীর সমর্থনে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী জয়লাভ করে এবং আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে (জুলাই, ১৯৩৭)।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে মতপার্থক্য শুরু হয়। উত্তরপ্রদেশে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট আর প্রকাশ্য আকার নেয়। এখানে কংগ্রেস সংগঠন ছিল নরেন্দ্র দেও আর বামপন্থীদের দখলে, অন্যদিকে মন্ত্রিসভায় গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের একাধিপত্য ছিল। কংগ্রেস সংগঠন মন্ত্রিসভাকে জনমুখী নীতি অনুসরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। প্রজা আইন বিল (১৯৩৮) সম্পর্কে কংগ্রেস সংগঠন নরেন্দ্র দেওয়ের

নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। তাঁরা জমিদারি প্রথার বিলোপ ও ভূমিরাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য দাবি জানাতে লাগলেন। আচার্য নরেন্দ্র দেও আর মোহনলাল গৌতম প্রস্তাবিত প্রজা আইনের বিরোধিতা করে সভাসমাবেশ করতে লাগলেন। আশ্চর্যের কথা, সমাজতন্ত্রের আদর্শে আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও নেহরু এই সময় নরেন্দ্র দেও আর তাঁর সমর্থকদের পূর্ণ সমর্থন জানান নি। এমনকী, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসিদের আনুগত্যহীনতার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৯৩৯ সালে নেহরু স্বয়ং উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রজা আইনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস আন্দোলনকে কিছুটা নমনীয় করে তোলেন। এ সময়ে উত্তরপ্রদেশ সংগঠনে নেহরুর বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী—মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী ও বোঝাপড়ায় বিশ্বাসী। স্বাধীনতার পরবর্তী কালেও শাস্ত্রী দলীয় কৌদলের ঊর্ধ্বে উঠে নেহরুর আস্থা অর্জন করেছিলেন।

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতিরূপে পুনর্নির্বাচিত হলে কংগ্রেস রাজনীতিতে যেন এক অভূতপূর্ব সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। একথা সত্য, সুভাষচন্দ্রের জয়লাভের জন্য উত্তরপ্রদেশে নরেন্দ্র দেওয়ের অনুগামী বামপন্থী কংগ্রেসিরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে ত্রিপুরী কংগ্রেসে (মার্চ, ১৯৩৯) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল আর নেহরু একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ, নেহরু—সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন যে সুভাষের পক্ষ সমর্থন করলে কংগ্রেসের মধ্যে পরিষ্কার ফাটল সৃষ্টি হবে এবং সাংগঠনিক দিক দিয়ে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য সবার উপর প্রয়োজন কংগ্রেসের সাংগঠনিক সংহতি রক্ষা। এই সময়ে নেহরু ও নরেন্দ্র দেওয়ের বিভিন্ন বিবৃতি আর প্রবন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতীয় বামপন্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট মতবিরোধ দেখা যায়। নেহরু মনেপ্রাণে ফ্যাসিবাদবিরোধী হলেও যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের সরকারি নীতিঅনুসরণ করেন এবং ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবে সমর্থন জানান। নরেন্দ্র দেও এবং অন্যান্য কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা প্রথম থেকেই বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপে অভিহিত করেন এবং সর্বাত্মক সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা অন্য মেরুতে বিচরণ করছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানির দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁরা জনযুদ্ধ-তত্ত্ব গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধপ্রয়াসে সাহায্যদানে রাজি হন। এক কথায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে এক বিভাজনরেখা টেনেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে ক্ষমতাহস্তান্তরের বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার পথে অগ্রসর হয়। কংগ্রেস সংঘর্ষের পথ থেকে সরে এসে এইসব আলোচনায় যোগ দেয়। সমাজতন্ত্রী নেহরু আর গান্ধীপন্থী প্যাটেল তখন সহমতে পৌঁছে গেছেন। অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পার্টি আর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা আপোসের পথ মেনে নিতে রাজি হলেন না। যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থানে তাঁরা একই পথের পথিক হলেন। অবশেষে মাউনটব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে কংগ্রেস যখন দেশবিভাগের বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত মেনে নিল, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর নেহরু আর নরেন্দ্র দেও দুই ভিন্ন পথের পথিক হলেন। দুর্ধর্ষ সংগ্রামী নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী-রূপে প্রশাসকের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শে অবিচল নেহরু এক জনকল্যাণকামী কাঠামো গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁরই উদ্যোগে কংগ্রেস ১৯৫৫ সালে আবাদি কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের

সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির বনিয়াদ রচিত হয়। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের কংগ্রেসের প্রতি মোহ ভেঙে গেল। তাঁদের ধারণা হল—শাসকদলরূপে কংগ্রেস এখন জনবিরোধী, মূলধনতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে। তাই সমাজবাদকে রূপায়িত করতে হলে কংগ্রেসের বিকল্প একটি শক্ত সমাজতান্ত্রিক বিরোধী দল প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখেরা সমাজতন্ত্রী দল গঠন করলেন (১৯৪৮)। নরেন্দ্র দেওই হলেন এই দলের কর্ণধার। এদিকে আচার্য কৃপালনী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা ১৯৫০ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি গঠন করেন। পরবর্তী কালে সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি একত্রিত হয়ে প্রজা সোস্যালিস্ট দল (পি. এস. পি.) গঠিত হয়। নরেন্দ্র দেও এই দলের চেয়ারম্যান হন এবং এই দলের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যসভার সদস্য হন। বিরোধী নেতারূপে নরেন্দ্র দেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংসদীয় কার্যকলাপ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু রাজনীতিবিদ রূপেই নয়, স্বাধীনতার পরবর্তী কালে দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ হিসেবেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রথমে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়, পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে তিনি আসীন ছিলেন।

১৯৫৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্র দেওয়ের দেহাবসান ঘটে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যপূরণে তিনি সফল হন নি। নেহরুও কতটা সমাজতন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ার স্বপ্ন এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। তবে নেহরু বুঝতে পেরেছিলেন—সমাজতন্ত্র শুধু শ্লোগান- ও তত্ত্ব সর্বস্ব হয়ে থাকলে চলবে না, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ সমাজতন্ত্রবাদ।

নেহরু সরকারিভাবে আর নরেন্দ্র দেও বিরোধী নেতারূপে সমাজতন্ত্রের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার বজায় রেখেছিলেন। তাঁরা দুজনেই গণতান্ত্রিক রাতি-নীতি এবং মানবিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে যান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন না। নরেন্দ্র দেও জাতীয় ঐতিহ্য এবং মানবিক মূল্যবোধকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে জরুরি বলে মনে করতেন। বিশ শতকের শেষ দশকে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারছি—মানবিক মূল্যবোধের অভাবে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র—দুইই অর্থহীন হয়ে ওঠে। মূলধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র হয়ে ওঠে জনবিরোধী, আর আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত সমাজতন্ত্র মনুষ্যত্বের পক্ষে কারাগারে পরিণত হয়। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে নেহরু আর নরেন্দ্র দেওয়ের প্রাসঙ্গিকতা স্মরণীয়। তাঁরা দুজনেই ছিলেন গান্ধীপন্থীদের মধ্যে সমাজ-বাদী, আর সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে গান্ধীবাদী।

গ্রন্থসমালোচনা

উচ্চশিক্ষার মৌলিক সমস্যা

অলোক রায়

অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতকীর্তি, ভবতোষ দত্ত মহাশয় জীবনসায়াহ্নে চোদ্দটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তাঁর সারা জীবনের শিক্ষাভাবনার প্রধান কয়েকটি দিক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। শিক্ষা-ভাবনা বলতে এখানে কোনো তত্ত্বগত বিমূর্ত ভাব বা আদর্শের কথা বলা হয় নি। দীর্ঘকাল যিনি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন, এবং পরবর্তী কালে শিক্ষা-অধিকর্তা ও শিক্ষাসচিব হিসাবে সরকারি শিক্ষানীতি প্রয়োগ-প্রবর্তনের প্রত্যক্ষ সুযোগ যাঁর ঘটেছে, সেই কিংবদন্তীপুরুষ তাঁর অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন অধিকাংশ প্রবন্ধে। সেই সঙ্গে ১৯৮১ সালে নিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ-শিক্ষা-পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি হিসাবে (বিখ্যাত "ভবতোষ দত্ত কমিশন") বহুবিচিত্র তথ্য-সংগ্রহের পর উচ্চশিক্ষার সংকট, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা শুধু একটি প্রবন্ধে নয়, অনেক-গুলি প্রবন্ধেই ধরা পড়েছে। গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে কমিশনের ২২৮টি প্রস্তাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছেন, এইসব প্রস্তাব নিয়ে 'বিতর্ক হোক, এটাই কাম্য—কিন্তু তাও হচ্ছে না। ধারণা হতে পারে যে শুধু সরকার নন, অন্য কেউই (বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষককুল) কোনো বড়ো রকমের পরিবর্তন চান না। যদি তাই হয়, তাহলে উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। কমিশন বা কমিটি বসবে, মাঝে-মাঝে। কমিশনের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধি হবে। নতুন তথ্য সংগৃহীত হবে, জ্ঞানীগুণী জনের সঙ্গে আলোচনা হবে—এবং তারপরে রিপোর্ট দেওয়া হবে। সেইখানেই ইতি।' (পৃ ১০৭)। কিন্তু এই "মা ফলেষু" নীতি যে শুধু কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাই নয়, লেখকের "শিক্ষাভাবনা" সম্বন্ধেও অনেক পরিমাণে প্রযোজ্য। জানি না কতজন "শিক্ষাভাবনা" বইটি মন দিয়ে পড়বেন, লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে ভাববেন, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা—তাঁর প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করবেন বা যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করবেন। খুবই নৈরাশ্যজনক চিত্র। কিন্তু এর কারণও তো লেখকের অজানা নেই। আর তখনই প্রশ্ন জাগে, কাদের জন্য তিনি এই বই লিখছেন? সরকার, কিংবা সরকারি আনুকূল্যপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত কলেজ—কেউই উচ্চশিক্ষার মৌলিক সমস্যা নিয়ে ভাবতে রাজি নয়। আর, 'কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলি তাঁদের কাজের শর্তাবলীতেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন, আসল শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো চিন্তাভাবনা নেই।' (পৃ ১০২)। কিন্তু তাই বলে শিক্ষকদের মধ্যে কেউই যে চিন্তাভাবনা করেন না, তা নয়,—চিন্তাভাবনা, এমনকি প্রতিবাদও আছে। শিক্ষকেরা যে সকলে শুধু মাইনে বাড়ানোর আন্দোলনেই উৎসাহী, তাও নয়। শিক্ষাসমস্যা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে, কিন্তু যাঁদের হাতে নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা ন্যস্ত তাঁরা অবিচলিত।

যেমন ধরা যাক, বি-এ ক্লাসে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজি ভাষাকে বাদ দিয়ে 'আবশ্যিক অতিরিক্ত' হিসাবে যে সোনার পাথরবাটির প্রবর্তন হয়েছে ('পরীক্ষা দিতেই হবে এই অর্থে ইংরেজি আবশ্যিক, কিন্তু পাশ না করলেও চলবে এই অর্থে ঐচ্ছিক।') লেখক একাধিক প্রবন্ধে তাকে হাস্যকর ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মান অবনয়নের প্রয়াস বলেছেন। কোনো সন্দেহ নেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইংরেজি ও বাঙলার শিক্ষকদের প্রবল আপত্তি ছিল! (ভবতোষ দত্ত অবশ্য বাঙলা ভাষাকে আবশ্যিক রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি। পশ্চিমবঙ্গে বি-এ ক্লাসে ইংরেজি বা বাঙলা কোনো কিছুই অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় নয়। লেখকের মনে হয় এ সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট, অথবা বাঙলা ভাষাকে তিনি ইংরেজির মতো অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় মনে করেন না, তা না হলে একাধিকবার তিনি লিখতেন না—'এই যুক্তিতে সর্বাগ্রে গণিত পড়ানো তুলে দেওয়া উচিত, এবং বাঙলাও, কারণ বাঙলায় ফেল হয় অনেক পরীক্ষার্থী।') কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষানীতি রচনা করেন রাজনৈতিক নেতারা, আর রাজনৈতিক নেতাদের কথামতো এক-দল শিক্ষকও সমর্থন করেন তাঁদের ভ্রান্ত নির্দেশ। এক্ষেত্রেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভবতোষ দত্তের মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের বক্তব্যে যখন কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন না তখন আমাদের মতো নগণ্য শিক্ষকদের অভিমতের মূল্য কতটা?

কিংবা আর-একটি প্রসঙ্গ বিভিন্ন আলোচনায় বার-বার ফিরে-ফিরে এসেছে—'আমরা শত শত কোটি টাকা খরচ করে বেকার ম্যাট্রিকুলেটকে বেকার গ্র্যাজুয়েটে পরিণত করছি', যার পিছনে আছে রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য ('এরা হয়ে দাঁড়ায় রাজনীতিকদের সংরক্ষিত সৈন্য—যে কোনো কাজে এদের সাহায্য না পেলে রাজনীতিকদের চলে না।') এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা (কর্মসংস্থানসৃষ্টির অক্ষমতা)। বলা বাহুল্য, এসব কথা খুবই সত্য। কিন্তু উচ্চশিক্ষার সুযোগ যদি যোগ্য ছাত্ররাই পায় (যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, এমনকী সাম্যবাদী দেশেও ঘটে), তাহলে বাকি ছাত্রদের স্কুলশিক্ষার পরেই কাজ দিতে হবে। অর্থনীতিবিদ আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ত্রুটি নির্দেশ করতে পারেন, কিন্তু কলেজ বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ ব্যাপারে ঠিক কী করার আছে তা বুঝতে পারি না। যদিও ভবতোষ দত্ত আগেই জানিয়ে রাখেন, 'আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে আমরা আদর্শকে এত উঁচুতে নিয়ে যাই, যে কাম্য এবং সম্ভবপরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থেকে যায়।···সর্ব-বিষয়ে পূর্ণতা একটা বড় আদর্শ, কিন্তু এই পূর্ণতার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন।···বায়ুভূত আদর্শের চেয়ে বাস্তব লক্ষ্যই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।' (পৃ ১১) কিন্তু অল্প পরেই তিনি বলেন, 'আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির গতিপথ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা সৃষ্টির গতিপথ সমান্তরাল হতে হবে। সোজা কথায়, আমরা চাই অর্থনৈতিক-পরিকল্পনা আর শিক্ষাপরিকল্পনা একই বৃহত্তর পরিকল্পনার দুটি অঙ্গ হোক।' (পৃ ২১)। এখানে এই চাওয়াকে 'বায়ুভূত আদর্শ' বলব না, কিন্তু বাস্তবে এই আদর্শের রূপায়ণ কিভাবে সম্ভব তার ইঙ্গিত লেখকের শিক্ষাভাবনার মধ্যে মেলে না।

অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, 'বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে।' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার মোহ স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে প্রসার লাভ করেছে তা আমাদের অনেকের পক্ষেই যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ। কিছু নতুন অধ্যাপক-পদসৃষ্টি ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনো রকম সাহায্য করতে পারে নি। ভবতোষ দত্ত অত্যন্ত সংগত কারণেই বলেন, 'নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে শিক্ষার মান উঁচু করা যায় না। কলেজ-প্রশাসন এবং পরীক্ষা পরিচালনার সুবিধার জন্য নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হতে পারে। যুক্তি হিসাবে

শিক্ষাভাবনা—ভবতোষ দত্ত। নাভানা, পি ১০৪ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২। মার্চ ১৯৮৮। তিরিশ টাকা।

বলা হয় যে, নূতনতর বিষয়ে বিশেষভাবে অধ্যাপনার জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার হতে পারে। এ যুক্তি বাস্তবক্ষেত্রে দুর্বল, কারণ একবার একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পারিপার্শ্বিকের চাপে সেটা অল্পদিনের মধ্যেই গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়।' অথচ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না—'এমনিতেই সারা দেশে যোগ্য পণ্ডিতের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, তাছাড়া শিক্ষিত তরুণদের একটা বিরাট অংশ অন্য নানা দিকে চলে যায়, কারণ সেখানে আর্থিক আকর্ষণ অনেক বেশি।' (পৃষ্ঠা ১২)

এই অবস্থায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো কয়েকটি কলেজকে (লেখক বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের কথা বলেছেন বারবার এই দাবি ও যুক্তির সমর্থনে) স্বয়ংশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাদানের যুক্তি ঠিক বোঝা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় যদি শুধু উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয় তাহলে আপত্তির কিছু নেই (রবীন্দ্রনাথ "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ" প্রবন্ধে যেজন্য 'গবেষণাবিভাগে'র বিশেষ গুরুত্বের কথা বলেছিলেন, কারণ 'বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানো'ই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ), সে অবস্থায় কলেজগুলিতে শুধু পঠন-পাঠনের কাজ হলেই যথেষ্ট। কলেজগুলি স্বয়ংশাসিত হল কিংবা হল না, সেটা শিক্ষার মান উন্নয়নে খুব জরুরি এমন মনে হয় না, অন্তত কলেজীয় শিক্ষার সঙ্গে এই মুহূর্তে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে (এমনকী প্রেসিডেন্সি কলেজেও) তাঁরা স্বয়ংশাসনের জন্য খুব ব্যাকুল নন। (বদলিবদ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তুল্য বেতন এবং পদমর্যাদা, স্বরচিত গ্রন্থের প্রচার ইত্যাদি ব্যক্তিগত লাভের কথা যাঁরা ভাবেন তাঁদের কথা বাদ দিচ্ছি)। আসলে ভালো, কিংবা তথাকথিত মন্দ কলেজগুলির সমস্যা অন্যত্র—ছাত্রসংখ্যা কেন সীমিত রাখা সম্ভব হচ্ছে না, কলেজ পরীক্ষায় তো বটেই, এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও কোনো নীতি বা উচ্চমান রক্ষিত হচ্ছে না কেন, শিক্ষকদের একটা বড়ো অংশ (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসমিতি যাঁদের প্রতিনিধি) তাঁদের দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক বা অক্ষম কেন—ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি নিয়ে ভাবতে হবে। কয়েকটি তথাকথিত ভালো কলেজকে স্বয়ংশাসন এবং ডিগ্রি বিতরণের সুযোগ দিলেই উচ্চশিক্ষার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন সর্বরোগহর চিকিৎসায় আমাদের আস্থা নেই। এখানে 'এলিটিজ্‌ম্‌'এর প্রসঙ্গ আদৌ উঠছে না—'এলিটিজ্‌ম্‌' অন্য নামে বা ভাবে শিক্ষা-জগতে আজও আছে, পরেও থাকবে (কলকাতায় কয়েকটি কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য ছাত্রদের ব্যাকুলতা যার নিদর্শন)। কিন্তু ভালো কলেজ, যেখানে ভরতির সময় খুবই উচ্চমান রক্ষিত হয়, অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রচুর মার্কস না পেলে যেখানে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার নেই, সেখানেও দু বছর বা তিন বছর পড়ার পর অধিকাংশ ছাত্র যথেষ্ট ভালো ফল করতে পারে না কেন? প্রেসিডেন্সি কলেজেও বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্ররা পরীক্ষায় ফেল করে। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে মাত্র একজন ছাত্র, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বনিম্ন স্থানেও তাদের দেখতে পাই কেন? আর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে (লেখকের ভাষায় 'পরীক্ষা দেওয়া তোমার অধিকার, ফল পাবার অধিকার তোমার নয়।' (পৃ. ১০১)। অথচ আমরা মনে রাখি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগ্রহণ বা পাঠক্রম নির্ধারণের দায়িত্ব এখন কলেজের অধ্যাপকের মুখে শোভা পায় না—'ছাত্রসংখ্যার চাপে পাঠক্রম, পাঠ্য বই, পরীক্ষা-ব্যবস্থা সবই লঘিষ্ঠ সাধারণ স্তরে নামিয়ে আনতে হয়, যার ফলে প্রেসিডেন্সির মতো কলেজ সুবিচার পায় না। ভালো শিক্ষকেরা হতাশা বোধ করেন, যখন তাঁরা দেখেন যে বর্তমান অবস্থার চাপে পড়ে পড়ানো একটি নিম্নমানের পরীক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হয়।'

(পৃ. ৬২)। অন্যদিকে লেখক জানেন, 'বর্তমান যা অবস্থা তাতে গুণী অধ্যাপকের অপ্রাচুর্য, অর্থের অপ্রাচুর্যের চেয়ে কম নয়।' বিশ্ববিদ্যালয়তেই যখন 'গুণী অধ্যাপকের অপ্রাচুর্য' তখন স্বয়ংশাশিত কলেজগুলিতে গুণী অধ্যাপক কেমন করে মিলবে তাও বুঝতে পারা যায় না।

অধ্যাপক হয়ে অধ্যাপকের সমালোচনা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সারা জীবন অধ্যাপনার পর যখন অধ্যাপকদের অধ্যয়নহীন জিজ্ঞাসাশূন্য নির্বিবেক উচ্চাভিলাষী চরিত্র বর্ণনা করতে যান, তখন পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হয় কাকের মাংস কাক খায় না। ভবতোষ দত্ত নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রশ্ন তোলেন—'শিক্ষক হিসাবে আমাদের যা করণীয়—পাঠক্রম সুষ্ঠুভাবে শেষ করা, নিজেকে অধিকতর শিক্ষিত করে তোলা ইত্যাদি—তা কি আমরা সবাই করি? আমরা যারা গবেষণা-নিবন্ধ লিখে ডক্টরেট পাই, তারা ডিগ্রি পাবার পরে আর কোনো কাজ করি না কেন?...যেসব ছাত্রদের পাঁচ বছর অনার্স আর এম-এ পড়িয়ে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মার্কা দিয়ে ছেড়ে দিই, তারা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন-চার বছর কাটাবার পর উঁচুদরের গবেষক হয়ে ওঠে কী প্রকারে?' (পৃ ১৭)। তিনি জানেন, শুধু বিহার নয় 'পশ্চিমবঙ্গেও অনেক বিষয়ে কোনো-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার নামে যা হয়েছে তার কোনো ভদ্র সংজ্ঞা নেই।' (পৃ ১৪)। 'গবেষণা একটা পুজনীয় অপদেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং চাকুরিজীবনের উন্নতিতেই হয় গবেষণার একমাত্র সার্থকতা। গবেষণা যদি জীবনব্যাপী অনুসন্ধিৎসা হয়ে না দাঁড়ায়, তাহলে তার কোনো মূল্য নেই।' (পৃ ২৮)। 'একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর যোগ্যতার বৃদ্ধির প্রমাণ দেন তাঁর লেখা বই ও প্রবন্ধের (সংবাদপত্রে লেখা প্রবন্ধ শুদ্ধ) সংখ্যা দেখিয়ে এবং এটা দেখিয়ে যে তাঁর তত্ত্বাবধানে কত ছাত্র গবেষণা করছে। কখনো একজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে গবেষণারত ছাত্রের সংখ্যা এত বেশি যে কেউ কিছু করে না বলেই বন্দোবস্তটা সচল থাকে।... দ্বিতীয় অপ্রীতিকর ব্যাপার হোল যে অনেক সময় রেজিস্ট্রি করা গবেষকেরা গবেষণা করেন মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে।... যদি বলা হয় যে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি আসলে গবেষণা নয়, গবেষণাপদ্ধতির শিক্ষা মাত্র, তাহলেও অনেক নিবন্ধে এমন কোনো শিক্ষা দেখতে পাওয়া যায় না যা পরে কাজে লাগবে।' (পৃ ৬৭)। 'গবেষণার জন্য আত্মিক আকর্ষণে হয়তো অনেকে অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু নতুন-নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাবার জন্য বা নিযুক্তির উচ্চতর স্তরে উঠবার জন্য একটা গবেষণা ডিগ্রি প্রয়োজন, এই উপলব্ধিতেও আকৃষ্ট হলেন আরো অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকেরাও তাঁদেরও তত্ত্বাবধানে কত ছাত্র গবেষণা করছে তার তালিকা দিয়ে নিজেদের গুণপনা প্রচার করছেন। অবস্থাটা এমন হোল যে এক-একজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে হয়তো দশ-বারোজন গবেষক ছাত্রের নাম লেখানো আছে। ফলে তত্ত্বাবধান কিছু হয় না, কারণ গবেষক-ছাত্র যদি কাজ করেন, তাহলে তাঁর অধ্যাপককেও অনেকটা খাটতে হয়।' (পৃ ৭৫-৭৬)। বইটি থেকে এই ধরনের আরও অনেক উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা যাবে, এবং লেখক যদিও আশাবাদী, তবু গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধের শিরোনাম "মা ফলেষু" হয়তো তাঁর অজ্ঞাতসারে বর্তমান উচ্চশিক্ষার যথার্থ পরিচয় সূচিত করেছে।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে লেখা (ভূমিকায় যদিও বলা হয়েছে 'প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে তারিখ দেওয়া আছে', কিন্তু কার্যত তারিখ নির্দেশ করা হয় নি। এমনকী সমাবর্তন-ভাষণ ছাড়া অন্যত্র প্রবন্ধ-রচনার উপলক্ষ বা প্রথম প্রকাশের উৎস নির্দেশ করা হয় নি)। ফলে প্রবন্ধগুলির মধ্যে শুধু পুনরুক্তি নয়, দ্রুত রচনার নিদর্শন হিসাবে তথ্যগত ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতাও থেকে গেছে। 'হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের খাতায়' আদৌ 'কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পরে রেভরেণ্ড)' নাম পাওয়া যায় না। কৃষ্ণমোহন এখানে কালীমোহনে রূপান্তরিত। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের তিন দফায় তালিকাভুক্ত করার প্রয়াসও বিভ্রান্তিকর। রসময় দত্ত কোনো সময়েই হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা করেন নি। অবশ্য এগুলি তুচ্ছ ভুল। বক্তব্যের মূল্য এর ফলে কমে না। তবে মুদ্রণের ব্যাপারে "নাভানা"র কাছে আর-একটু সতর্কতা ও দায়িত্ববোধ প্রত্যাশিত ছিল। একদা নাভানার বই মুদ্রণসৌষ্ঠবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু এখন একশো সাত পৃষ্ঠার বইয়ের দাম তিরিশ টাকা করা হলেও, এমন বীভৎস ছাপা একালে কদাচিৎ দেখা যায়। প্রত্যেক পাতাতেই অজস্র ছাপার ভুল, এমনকী একটি পাতায় বারোটি ছাপার ভুলও চোখে পড়েছে (পৃ ৪০)। তা ছাড়া, অন্তত দু জায়গায় বড়ো রকম 'কপি ছাড়' ঘটেছে,—৫৬ এবং ১০৪ পৃষ্ঠায় শেষ বাক্যটি শুধু অসম্পূর্ণ তাই নয়, পরের পৃষ্ঠার প্রথম বাক্যটিও পূর্বসম্পর্করহিত। আমাদের দেশে এই ধরনের 'ভুলে ভরা' বই প্রকাশিত হয় শুধু পাঠককে অগ্রাহ্য করার মনোভাব থেকে নয়, লেখককেও অসম্মান করার প্রবৃত্তি থেকে॥

জাতীয় আন্দোলনের দুটি রূপ

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

১.

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট বিপ্লবী জীবনতারা হালদারের (১৮৯৩—১৯৮৯ খ্রী) সদ্যঃ প্রকাশিত বই "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা" স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বইটি একেবারে নতুন নয়। লেখক ভূমিকাতে লিখেছেন—'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস নামে আমার বইখানা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে। ...সেদিনের পরিপ্রেক্ষিত আজ আর নেই। অনেক কথা ও ঘটনা সেদিন যেমন ভাবে দেখেছি ও ভেবেছি আজ তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মনে হচ্ছে সেদিনের অনেক ঘটনার মূল্যায়ন আবার নতুন করে করা প্রয়োজন।' বর্তমান বইটিকে ১৯৫১ সালের বইয়ের পুনর্লিখিত রূপ বলা যায়। বলা বাহুল্য, সংযোজন-সংশোধনের ফলে অনুশীলন সমিতির ইতিহাস এবং এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অনুশীলন সমিতির কর্মধারায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র রূপ পরিস্ফুট হয় না। এটিকে আন্দোলনের ভগ্নাংশ বলা যেতে পারে। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই একপেশে। ধর্মীয় অন্ধতা আর সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আচ্ছন্ন করেছে। আন্দোলনের গতিকে করেছে মন্থর। কখনো-কখনো মূল ধারাকে উলটো দিকে চালাবার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা অনৈতিহাসিক। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসে যে-সমস্ত ফাঁদ তৈরি করেছিলেন তাতে পা দিয়েছেন অনেকেই। উদ্দেশ্য, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি। স্বার্থসিদ্ধির বহর কতটা বা তাতে লাভালাভ কী হয়েছে—তা তর্কের বিষয়, কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে অনেকটাই বিকৃত পন্থা অবলম্বন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্র কানুনগো (১৮৭১-১৯৫০ খ্রী) তাঁর "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" (১৯২৮ খ্রী) বইটিতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'হিন্দু ধর্মের মধ্য দিয়ে ভারত উদ্ধার, এ সহজ কথা মুসলমান ভায়াদের বুঝিয়ে দিতে হয় না; পরন্তু এ তাঁদের আঁতে যে কী রকম ঘা দেয়, তা বলা বাহুল্য মাত্র। এতে মুসলমানগণ এই আন্দোলনে যে কেবল যোগ দিতে বিরত থাকতে পারেন তা নয়, তাঁরা ইংরেজের অপেক্ষাও হিন্দুদের প্রবল শত্রু না হয়ে পারেন না।' বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কতকগুলি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল যেগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভারতকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করা। তাঁদের আদর্শ ও লক্ষ্যকে এক ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা গ্রাস করেছিল। ফলে জন্ম নিয়েছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। এর থেকেই সৃষ্টি হয় এক ধরনের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪ খ্রী) অনুশীলনতত্ত্ব, আনন্দমঠের আদর্শ, বন্দেমাতরম সঙ্গীত এবং হিন্দুধর্মের নানান অনুষ্ঠানের প্রতি আস্থা স্বাভাবিক কারণেই অহিন্দুদের অন্তস্থিতে ফেলেছে। কিছুটা সন্দেহপ্রবণও করে তুলেছে। সেই সঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে অনীহাও প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারে অহিন্দু সম্প্রদায়ের দোষের কিছু নেই। বরং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জাতির স্বার্থ থেকে কিছুটা সরেই গিয়েছিল। ফলে অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তর দলের ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো কিছুই নির্দ্বিধায় একবাক্যে মেনে নেওয়া শক্ত। তবু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে "অনুশীলন সমিতি" বা এ ধরনের অন্যান্য সংগঠনগুলি—যেমন, কলকাতার "আত্মোন্নতি", "ডন সোসাইটি", "স্বদেশ সেবক সমিতি", "ছাত্রভাণ্ডার", চন্দননগরের "বান্ধব সমিতি", ময়মনসিংহের "সুহৃদ সম্মিলনী", বরিশালের "স্বদেশ বান্ধব সমিতি", ফরিদপুরের "ব্রতী সমিতি" প্রভৃতির-ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই-সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের দেশপ্রেম সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বৈপ্লবিক কর্মধারার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ থেকেই যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বকে আশ্রয় করে ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র বসুর (১৮৭৬-১৯৪৮ খ্রী) নেতৃত্বে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য ও শক্তি চর্চার উপরও তাঁরা নজর রাখতেন। সতীশচন্দ্র মনে করতেন 'দুর্বলতার অপবাদ ঘুচিয়ে, বাঙ্গালীকে শক্তিশালী করতে হবে।' (পৃ. ২৩)। শুধু তাই নয়, 'বাঙ্গালী জাতিকে শৌর্যে বীর্যে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হবে, বাঙ্গালী জাতি সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করবে।' (পৃ. ২৪)। আর তার ভিত্তি হবে হিন্দুধর্ম, বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রী)-প্রদর্শিত পথ। তা হলে বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় প্রাধান্য বিস্তারই কি ছিল অনুশীলন সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য? বাঙালি বলতে কি বাঙলার বৃহত্তর জনসমাজকে বোঝাত? হিন্দু জাতীয়তাবোধ জাগরণের উদ্দেশ্যই কি ছিল তাঁদের কর্মসূচির মূল ধারা? প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০ খ্রী) কিন্তু এই উদ্দেশ্যেরই সমর্থক। অন্তত তাঁর কর্মধারা এবং রচনাবলীর মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে। প্রমথ মিত্রের ছেলে পৃথ্বীরাজ মিত্র "এ ব্রিফ্ স্কেচ অব দ্য লাইফ অব প্রমথনাথ মিত্র (এ ক্যালকাটা ব্যারিস্টার) দ্য ফাউনডার অব দ্য অনুশীলন সমিতিস্ অব বেঙ্গল" (১৯৪৫) নামক একটি জীবনী লেখেন। এই অপ্রকাশিত জীবনীটি থেকে প্রমথ মিত্রের চিন্তনের একটি রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমশ সমিতির বিস্তার হতে থাকে। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাখা প্রতিষ্ঠায় প্রমথনাথের অবদান অনস্বীকার্য। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম নেতা পুলিন দাস (১৮৭৭-১৯৪৯

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা—জীবনতারা হালদার। প্রকাশক কলকাতা। এপ্রিল ১৯৮৯। পঁচিশ টাকা।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়—সুনীল সেন। চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা। আগস্ট ১৯৮৯। আঠারো টাকা।

খ্রী) ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শারদীয় "যুগান্তর" পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'আমি [প্রমথনাথ মিত্র] কলিকাতায় নাম দিয়াছি অনুশীলন সমিতি, তোমরা সেই নামই দাও, তবেই বঙ্গদেশময় এক নামে একটি বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইবে ; বঙ্কিমবাবুর অনুশীলন প্রবন্ধ হইতেই আমি এই নামটি গ্রহণ করিয়াছি, —অনুশীলন শব্দের অর্থ—চর্চা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখ, আমরাও চর্চা ও পরীক্ষা দ্বারা যেখানে যাহা ভালো পাইব তাহাই গ্রহণ করিব। তাই এই সমিতির নাম অনুশীলন সমিতি হইল। পি. মিত্র সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন।' গোটা বাঙলায় অনুশীলন সমিতির প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। জীবনতারা হালদার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'এক সময়ে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়। ভিক্ষার রাজনীতিতে তাঁর কোনো আস্থাই ছিল না। নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী হিসেবে তাঁর চরম পন্থাতেই বিশ্বাস ছিল।' (পৃ. ৬৫)। আর বিশ্বাস ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদে। তাঁর অন্যতম ভাবশিষ্য পুলিন দাস অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। পুলিন দাসের নেতৃত্বে সংগঠন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং 'অতি সত্বর পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক শাখা-সমূহের প্রসার লাভ ঘটে। ১৯০৮ সালে যখন পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে অনুশীলন সমিতিসহ বিভিন্ন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হল তখন বিভিন্ন স্থানে পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির প্রায় ৬০০ শাখা-সমিতি ছিল।' (পৃ. ৭০)।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪ খ্রী) অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। জীবনতারা লিখছেন, '১৯০৫ সালে আমরা দুজনেই অনুশীলন সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলাম।' (পৃ. ৭১)। সমিতিতে যোগ দেওয়ার পর এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৬-১৯৭৬ খ্রী) পরিচয় এবং পরে ঘনিষ্ঠতা হয়। 'কলিকাতার পাড়ায়-পাড়ায় অনুশীলন সমিতির শাখার ছেলেরা ব্যায়াম করছে, লাঠি খেলছে।···মনে পড়ছে, যাদুদা তখন সব্যসাচীর মতো দুই হাতে হাতিয়ার চালাতে পারতেন বলে খ্যাতি ছিল। পরে একটু বেশী বয়সে তাঁর সাহচর্য পেয়েছি।' (পৃ. ১৪৮)। যাদুগোপালের "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" (১৯৫৬) বইটিতে অনুশীলন সমিতি সম্পর্কিত অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে যা জীবনতারার বইটির ঘটনাবলীকে সমর্থনই করে। ২ এপ্রিল ১৯৫৩ সালে জীবনতারাকে যাদুগোপাল লিখছেন, 'তোমার প্রেরিত ছ-কপি অনুশীলন সমিতির ইতিহাস পেয়েছি। পড়ে দেখলাম। স্বল্প পরিসরে সুন্দর লেখা হয়েছে। সমিতি যে মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিল এবং আজ আবার সমিতির কাজ আরম্ভ হওয়া ও দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়া প্রয়োজন—একথা খুব সময়োপযোগী।' (পৃ. ১৫০)। ১৯৫৩ সালে অনুশীলন সমিতির আর প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাসের নিয়মেই তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সুতরাং এখানে আমরা জীবনতারা বা যাদুগোপাল কারোর সঙ্গেই একমত নই।

এই ছোট্ট বইটিতে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছোটোবড়ো অনেক ব্যক্তির নাম এসেছে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অনুশীলন সমিতির সামগ্রিক রূপটি ধরার চেষ্টা করেছেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় লেখক তাঁর অনেক স্মৃতির উল্লেখ করেছেন। সব মিলিয়ে বইটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির ইতিহাস রচনার উপাদান হয়ে উঠেছে। অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে অন্যান্যদের রচনার সংক্ষিপ্তসার বা উল্লেখযোগ্য ও প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি; বিনোদবিহারী চক্রবর্তী (১৮৯৩-১৯৪৭ খ্রী) ও বিনয়কুমার সরকারের (১৮৮৭-১৯৪৯ খ্রী) বিশেষ ভূমিকার বিশ্লেষণ, রবীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী ও অন্যান্যদের সংযোগ —এ সমস্ত বেশ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। "অনুশীলন সমিতির সভ্যদের প্রতিজ্ঞা" অংশটি কাজে

লাগবে। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আমাদের বিশেষ আস্থা না থাকলেও সরকারি মনোভাব এই রিপোর্টে প্রতিফলিত, সেদিক থেকে এর অন্য মূল্য আছে। বর্তমান বইটিতে উক্ত রিপোর্টের আংশিক উপস্থিতি মূল বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রেখে বলা যায় এ ধরনের বইয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সংশয় অন্যত্র। অনুশীলন সমিতির আদর্শ সম্পর্কে জীবনতারা লিখেছেন, 'ভারতীয় কৃষ্টির চরম সামাজিক আদর্শ এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ, অশোক, শিবাজী প্রভৃতি আমাদেরই পূর্বপুরুষদের প্রদর্শিত পথে বাঙ্গালী তার স্বাধীনতার প্রেরণা পেয়েছিল।' (পৃ. ৩০)। এই ধারণার সত্যাসত্য সম্পর্কে আমরা সন্দিহান। এই ধারণাই ভ্রান্ত দেশাত্মবোধের জন্ম দিয়েছে। ফলে সেই দেশাত্মবোধ নিয়ে আমরা বেশি দূর এগোতে পারি নি।

২.

অধ্যাপক সুনীল সেন শুধুমাত্র পেশাদার ঐতিহাসিক নন, তিনি একজন রাজনৈতিক কর্মীও। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক সেন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। তার পরেও পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অব্যাহত। ফলে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ইতিহাস-চেতনাকে সমৃদ্ধই করেছে। সেই সমৃদ্ধ চেতনার প্রতিফলনে তাঁর ইতিহাসচর্চা আলোকিত। সম্প্রতি "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়" নামে তাঁর একটি ছোট্ট বই প্রকাশিত হয়েছে। এটি আসলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন আলোচনাচক্রের বক্তৃতার পরিমার্জিত রূপ। ভূমিকাতে লেখক বলেছেন, 'ভারত ছাড় আন্দোলন আমাদের দেশের বৃহত্তম রাজনীতিক আন্দোলন, যাতে অংশ গ্রহণ করেছিল শত সহস্র কৃষক এবং ছাত্র-ছাত্রী। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর নীতি, বিশেষ করে শ্রমিকদলের নীতি, পরিবর্তিত হয়েছিল প্রধানত ভারত ছাড় আন্দোলনের ধাক্কায়।···১৯৪৭ সালের বসন্তকাল থেকে বাম বিকল্পের সম্ভাবনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।···শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী বাস্তবে রূপায়িত হয় নি।'

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ এই আন্দোলন, হাচিনসের মতে, ছিল "স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব"। অথচ টটেনহ্যামের সরকারি বিবরণ একটু অন্য সুরে বাঁধা। আবার হারকোর্ট বিহারের আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এটিকে কৃষকবিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন। এর নেতৃত্বে ছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং পরবর্তী কালে, অধ্যাপক সেনের ভাষায়, 'কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত কৃষকসভার নেতৃস্থানীয় কৃষকরা আন্দোলনে যোগদান করেছিল।' (পৃ ২)। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। অংশগ্রহণেও উচ্চবর্ণের মানুষই বেশি। হেনিংহাম অবশ্য নিম্নবর্ণ-পরিচালিত কৃষকবিদ্রোহের কথাও বলেছেন। যাই হোক, অধ্যাপক সেন আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের তুলনায় মেদিনীপুরের আন্দোলন অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত ছিল।' (পৃ ৩)। এমনকী বিপ্লবীরা সেখানে জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। অবশ্য তা নানা কারণে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। তিনি দেখিয়েছেন, কঠোর সরকারি দমননীতি মেদিনীপুরের এই গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে যেমন তৎপর হয়ে উঠেছিল, তেমনি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মন্বন্তর-মহামারী। অধ্যাপক সেন দেখিয়েছেন, এই সময়ে কমিউনিস্টরাও পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরাও আন্দোলনে অংশীদার হন। '২৯ অকটোবর কমিউনিস্ট নেতা ভূপাল পাণ্ডা

একশো কৃষকের একটি মিছিল সংগঠিত করেন। লালপতাকা হাতে নিয়ে কৃষকরা গ্রামের উপর জরিমানার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।' (পৃ ৭)। শুধু তাই নয়, জমিদারদের গোলা থেকে ধান লুঠ করে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। এ ধরনের বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ঘটনারও সুদূরপ্রসারী ফল যে ছিল, তা বলা বাহুল্য।

এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় "জনযুদ্ধ"। শ্রমিক-শ্রেণীর শত্রু ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হচ্ছে জনযুদ্ধ। কমিউনিস্ট পার্টিই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। কলকাতায়. ১৯৩১ সালে কমিউনিস্টরা "রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" গঠন করেন। তা ছাড়া কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছেন। 'রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্র্যাডলি "লেবার মান্থলি" পত্রিকায় "দি অ্যানটি ইম্পিরিয়া-লিস্ট পিপলস ফ্রন্ট" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।' (পৃ ১৯)। তা ছাড়া রণদিভের "জেল-দলিল", পি. সি. যোশীর "ফরওয়ার্ড টু ফ্রিডম" প্রভৃতি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ছাত্র ফেডারেশন জনযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। '১৯৪১-এর ডিসেমবরে পাটনায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে জনযুদ্ধের ধ্বনি প্রথম শোনা গেল।' (পৃ ২১)। ছাত্র ফেডারেশন জাপ-বিরোধী নীতি অবলম্বন করায় অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি ছাত্র ফেডারেশনে বিরোধী হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক সোমেন চন্দকে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ড চলে আরো নানা জায়গায়। শুধু ছাত্ররা নয়, কৃষক-সভাও 'জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে।' (পৃ ২২)। এবং সারা ভারতে কৃষকসভার সংগঠন জোরদার হয়। মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি" (১৯৪৩) বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অধ্যাপক সেন স্বল্প পরিসরে জনযুদ্ধের একটি সামগ্রিক রূপরেখা স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করেছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে "যুদ্ধোত্তর যুগের জাগরণ" সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন। শ্রমিক সংগঠন, নৌ-বিদ্রোহ, বিহারের পুলিশ ধর্মঘট বা অন্যান্য সাধারণ ধর্মঘট এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এগুলির মধ্য দিয়েই জনজাগরণের স্পষ্টরূপ ফুটে ওঠে। সেই সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকাও পরিষ্কার হয়ে যায়। 'নৌবিদ্রোহ জনমানসে গভীর ছাপ ফেলেছিল।···জাতীয় নেতারা সেদিন আইন-শৃঙ্খলার ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্যাটেল এবং পাতিল··· প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। মুসলিম লীগের মুখ্য নেতা জিন্নাহ্ মুসলমান রেটিংদের কাছে ধর্মঘট প্রত্যাহারের আবেদন জানান।' (পৃ ৩৬)। কমিউনিস্টদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে ইতি-বাচক ছিল। তা ছাড়া নগ্ন কুশ্রী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কমিউনিস্টরা কখনো জড়িয়ে পড়েন নি। অধ্যাপক সেন এই বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তেলেঙ্গানার কৃষিবিপ্লব, ওড়িশার চুক্তিভাগ প্রথা, পাঞ্জাবের তেভাগা দাবি, পাতিয়ালায় গরিব কৃষকদের জমি দখল, বাঙলার তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কৃষি আন্দোলনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

শুধু তাই নয়, "দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন" এবং "ক্ষমতা হস্তান্তরের আর্থিক পটভূমি" শীর্ষক অধ্যায় দুটি ভারতের রাজ-অর্থনৈতিক চিত্র বুঝতে বিশেষ সহায়ক। ভারতীয় পুঁজিপতিদের চরিত্র ও কীর্তি অধ্যাপক সেন ঠিকই বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তীক্ষ্ণ।

বর্তমান বইটিতে কিছু-কিছু নতুন তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক ভূমিকাতেই তা উল্লেখ করেছেন, '··· নতুন তথ্য বিনা নতুন কথা বলা যায় না। কিছু নতুন তথ্য এই বইতে ব্যবহার করেছি। কেসির ডাইরি, শর্টকালেকশনস, ব্রিটিশ কর্মচারীদের স্মৃতি-কথা এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ওয়ার এবং পিপলস এজ আমি ব্যবহার করেছি।' নতুন তথ্যের আলোকে এই ছোট্ট বইটি আলোকিত হয়ে উঠেছে।

এক অন্য ইতিহাস

অমিতাভ রায়

এ এক বিপরীত বিবরণ; অন্যতর দৃষ্টিকোণ; প্রচলিত ইতিহাসের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বহু অজ্ঞাত ঘটনাকে উপস্থাপনার এক অভূতপূর্ব প্রয়াস; নতুন তথ্যসমৃদ্ধ ঘটনাপুঞ্জকে একত্রিত করে নতুনভাবে অতীতকে অবলোকনের প্রচেষ্টা,—"কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ।"

রাজনীতি অর্থনীতি সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পকলা থেকে শুরু করে সমাজ-সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি আমাদের ইতিহাসচর্চার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আধুনিক সমাজ-সভ্যতা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও এদেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশের কোনো ধারাবাহিক বিবরণ প্রচলিত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এমনকী, আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার সময়েও যে-কোনো কারণেই হোক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রটি মোটামুটি বর্জিত।

সুতরাং এদেশের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির বিপুল দান ছিল, সেইসব চরিত্রের সন্ধান পাওয়া আজ কষ্টকর।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় সমাজ অতি সীমিতভাবে হলেও শিল্পবিপ্লবের সুফল পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক যুগ থেকে ধনতান্ত্রিক যুগে প্রবেশের প্রথম যুগে ব্রিটিশ রাজের উদ্যোগে বহু ভারতীয়রও সম্যক উদ্যোগ ছিল। একমাত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামটিই ইতস্তত উচ্চারিত হয়। কিন্তু তিনি বিভিন্ন ব্যবসায় কুঁকি নিয়ে এগোনো ব্যতিরেকে অন্য কোনো কাজ করেছিলেন বলে তেমন শোনা যায় না। কিন্তু বাদবাকিরা? যাঁরা শ্রম আর সাধনার সমন্বয়ে ভারতের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ভিত্তিকে সুবিন্যস্ত ও মজবুত করার কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে রকমারি কাজ করেছিলেন, তাঁরা? শিল্পপতিরা মূলধন বিনিয়োগ না করলে নিশ্চয়ই দেশের শিল্পজগতের বনিয়াদ গড়ে উঠত না। কিন্তু যাঁরা শ্রম ও সাধনাকে সম্বল করে দেশের প্রযুক্তির বনিয়াদ শক্তপোক্ত করে গড়ে তোলার কাজে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে গেলেন, তাঁদের নাম বিশেষ জানা যায় না। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম তবুও মাঝে-মধ্যে শোনা যায়। অবশ্যই সেইসব বিজ্ঞানীদের নাম তুলনামূলকভাবে অধিক উল্লিখিত, যাঁরা ভারতীয় আন্দোলনে কোনো-না-কোনো ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

বাদবাকিরা অর্থাৎ যাঁরা ভারতীয় প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিলেন, এমন পাঁচটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করানোর দায়িত্ব সিদ্ধার্থ ঘোষ যথাযথভাবে পালন করেছেন। পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর সুকুমার রায়ের নাম বহুল পরিচিত; এইচ. বোস স্বল্পপরিচিত। কিন্তু গোলকচন্দ্র বা শিবচন্দ্র নন্দী? এঁরা তো আমাদের সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি চরিত্র। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বা সুকুমার রায় তাঁদের সাহিত্যকীর্তির জন্য সু-পরিচিত। সিদ্ধার্থ ঘোষ তাঁদের প্রযুক্তিগত ক্রিয়া-কর্মাদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এইচ. বোস বা হেমেন্দ্রমোহনের যেটুকু পরিচিতি তা মূলত কুন্তলীন তেল বা তৎসংক্রান্ত পুরস্কারের জন্য। কিন্তু এইচ. বোসের অন্যান্য বহুবিধ কাজকর্ম বোধ হয় এই প্রথম গ্রথিত হল।

মুদ্রণপদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজকর্মে উপেন্দ্র-

কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ—সিদ্ধার্থ ঘোষ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩। ১৯৮৮। ৬০ টাকা।

কিশোর রায়চৌধুরী এবং সুকুমার রায়ের অবদান সম্ভবত বহু শিক্ষিত বাঙালির ইতিপূর্বে অজানা ছিল। এইচ. বোস প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও এই তিনটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তাদের পরিশীলিত রূপান্তর পাওয়া গেল।

গোলকচন্দ্র ও শিবচন্দ্র নন্দীকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধ দুটি তথ্যসমৃদ্ধ। গোলকচন্দ্র ও শিবচন্দ্র নন্দীর উদ্ভাবনী-শক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে শিবচন্দ্র নন্দীর প্রশংসা করার সময় সিদ্ধার্থ ঘোষ সম্ভবত কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে পড়েছেন। কারণ 'লেখকের নিবেদন'-এ বলা হয়েছে, ছাঁচে ঢালা ইনজিনিয়াররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুনামের সঙ্গে চাকরি করেছেন বা নগণ্য কয়েকজন ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছেন। ডিগ্রীধারী প্রযুক্তিবিদদের সম্পর্কে এহেন মন্তব্য করার সময় সম্ভবত সিদ্ধার্থ ঘোষের খেয়াল ছিল না যে শিবচন্দ্রও সরকারি চাকুরি করতেন।

বাঙলার ইতিহাসের এক অবহেলিত অধ্যায় নিয়ে পাঁচটি "কেস স্টাডি" হিসাবে এই বই সার্থক। একটি প্রবন্ধের মুখবন্ধ হিসেবে লিখিত সত্যজিৎ রায়ের ভূমিকা বইয়ের প্রারম্ভে না দিয়ে যথাস্থানে দিলে বইটি সুবিন্যস্ত হত। অন্যথায় সমস্ত বইটির ভূমিকা আলাদা করে সত্যজিৎ রায় লিখে দিলে বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেত।

সবশেষে বলা যায়, তথাকথিত "ছাঁচে ঢালা" ইনজিনিয়ারদের কয়েকজন—বিশেষত রুড়কি থেকে ১৮৫১-য় ডিগ্রীপ্রাপ্ত সিভিল ইনজিনিয়ার নীলমণি মিত্র, শিবপুর কলেজ থেকে প্রথম এল. সি. ই. পাশ করা ইনজিনিয়ার দীননাথ সেন বা প্রথম ভারতীয় (ডিগ্রীপ্রাপ্ত) ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার গিরিশচন্দ্র বসুর উপর আলোকপাত করার প্রয়োজন ছিল। কারণ তাতে পরিষ্কার হত "ছাঁচে ঢালা" ইনজিনিয়াররা চাকুরি-জীবনে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে কী করেছিলেন, কী করতে পারেন নি।

এখনকার পাঁচখানি বাঙলা উপন্যাস

সুব্রত সরকার

ক্ষুধার অধিক কিছু নেই। পাপ ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। লিখেছিলেন এক কবি। মানুষের বহু-বিচিত্র ক্ষুধা আর পাপের লীলা নিয়ে বারবার সৃষ্টি হয়েছে শিল্প ও সাহিত্যের। "বাবা বাগেশ্বরের ঘোড়া" উপন্যাসটির ভিতরেও কীটের মতো ক্ষুধা আর পাপের সর্বনাশ এসে প্রবেশ করেছে। ইনজিনের শব্দের মতো একটানা আর্তস্বর শোনা যায় বইটির শেষ পাতা পর্যন্ত। পাঠক যেন লজঝরে টেম্পুতে করে অনন্তে চলেছেন। প্রকৃতি না টেম্পু থেকে গোঁ-গোঁ আওয়াজ আসছে, বোঝা যায় না। কাহিনীর নায়িকা স্মৃতি। নদী কুল ভেঙেছে, গড়বে বলেই তো! নিরীহ, প্রৌঢ় স্বামী রাখোহরির ভাগ্নে বাদল তার প্রেমিক। এ প্রেম দেহকে উর্ধ্বে রেখে নয়। আবার প্রেমের জন্যে যে শুদ্ধ মন চাই। তাকে কোথায় পাবে স্মৃতি? স্মৃতির জীবনের পথরেখা গেল বেঁকে। রাখোহরি তখন বেঁচে নেই। পারিবারিক আয়ের গোপন উৎস বাবা বাগেশ্বরকে সে ছিনিয়ে নেয় দাদা মাধবের কাছ থেকে। টাকার ভাগের জন্যে নয়, সে চায় বাগেশ্বরের পুরোহিত ওরফে বনডেড লেবার পরানের মুক্তি। সেই পরান যাকে লোভ দেখানো হয়েছিল ছোট্ট স্মৃতির স্বামী হবার। সেই পরান যে তার বাল্য-প্রণয়ের একমাত্র সাক্ষী আর সহযোগী। স্মৃতির ছেলে বাকুকেও কি তার অবর্তমানে কেউ দ্বিতীয় এক পরান বানাবার কৌশল করবে? তাই স্মৃতির এই প্রতিরোধ। কিন্তু স্মৃতি মানুষ, সামান্য মানবী। সারা জীবন আদর্শের পিছনে ছুটে বেড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। যা চেয়েছিল হয়েছে। সে এবার ধীরে-ধীরে হয়তো মাধবের এক নারী-সংস্করণ হয়ে উঠবে। বাদলকে ফিরিয়ে দেয় সে। এই হল খেলার প্রতিভা। সুশীল সিংহের ভাষা প্রায় কবিতার কাছাকাছি। এবং তিনি চালাকি করে স্মৃতি চরিত্রটির উপর এক ফাঁকে রাঙতার তলোয়ারের মতো এক চোখধাঁধানো কবি-চরিত্র রেখে দিয়েছিলেন, স্মৃতি এবং এই উপন্যাসটির সর্বনাশের জন্যে। এই অংশ-টুকুই এ উপন্যাসের দুর্বল দেহখণ্ড, আবার জন্মের লজ্জাস্থান। তাই মহার্ঘ্য, প্রিয়। ফিরে পড়বার জন্যে এই গ্রন্থজীবটি পাঠকের আলমারিতে সযত্ন স্থান আদায় করে নেবে। লুকিয়ে, এখানে-ওখানে একটু-আধটু ফিরে পড়ার মজা লুটতে বাবা বাগেশ্বরের টাট্টু দুরন্ত পাঠকের তখন সহযোগী হবে।

নবীন গল্পলেখক হিসাবে আফসার আমেদের নাম বেশ প্রচারিত। সুতরাং "সাহু আলির নিজের জমি" উপন্যাসটিতে এক নবীন প্রতিভার আলোকবিচ্ছুরণের জ্যোতি দেখা যাবে ভাবা গিয়েছিল। কিন্তু বিষয়, আঙ্গিক, এমনকী ভাষাব্যবহারের ভঙ্গিতেও আফসার আমাকে হতাশ করেছেন। ছিদ্রানুসন্ধান আলোচকের কাজ নয়, তবু এমন সব অসঙ্গতি ও জীর্ণতা উপন্যাস-টিকে জড়িয়ে ধরেছে যে লেখক যত্নবান হলে তা এড়াতে পারতেন। সুতরাং তার একটু উল্লেখ করছি। উপন্যাসের দ্বিতীয় বাক্য—'পাকাধানে ভরা মাঠ শুয়ে আছে।' কিছু পরেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় উপন্যাসের তৃতীয় স্তবকে লিখলেন—'পদচিহ্ন ছড়িয়ে আছে সারা খেত জুড়ে।' ধানভরা মাঠে পদচিহ্ন? প্রথম পৃষ্ঠাতেই জন-মজুর, খাটুনেদের বিয়ের কথা বলতে গিয়ে লিখলেন, 'যদি সোনার বোতাম পায় পাঞ্জাবিতে শোভা পাবে।' পরের জমিতে চাষ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কথা লিখতে গিয়ে লেখকের কি একবারও মনে পড়ে নি সোনার ভরি কত এখন? আর জন-মজুরেরা বিয়েতে পাওয়া সোনার বোতাম পাঞ্জাবিতে লাগিয়ে কোন্ কালে কোন্ দেশে অন্যের জমি চাষ করে দিয়েছেন? 'দুধ ওথলানো হাসি কেলোর কালো মোটা বউর সারা শরীর জুড়ে নদীর তীরে হাটের মত চর-চর জোয়ার এসে পসরা ছুঁই-ছুঁই গড়িয়ে পড়ে, আর রাগ আর সাংসারিক টানটান মুহূর্ত লাফিয়ে পড়ে আর কি, কেলো হাজামের বউর দুধ ওথলানো রাগ চটান হয়ে যায় নদীর মতো, কেলোর কাশির বেগ এলে।' (পৃ ১৫)। এই হল আফসারের এ উপন্যাসের বাক্যগঠন, ভাষা, উপমাপ্রয়োগ ও লিখনভঙ্গিমার নমুনা। যা আলোচককে ক্লান্ত করেছে। অসংগতির তালিকা আর দীর্ঘ না করে বলি আফসারের এই গ্রন্থটি বিষয়ের দিক থেকেও একঘেয়ে চর্বিতচর্বন। এ শুধু এক কলরোলময় নির্মাণ। শব্দের পবিত্র শিখা নিয়ে অপব্যবহার।

রূপনগর কোনো নির্দিষ্ট একটি জায়গা নয়। সারা পৃথিবীর এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে শত-শত রূপ-নগর। এখানকার মানুষেরা, তাদের পাপ-পুণ্য, লোভ, মোহ, ভালোবাসার ফুলে-ফলে পাতায়-পাতায় পৃথিবীকে পল্লবিত করে রেখে যাচ্ছে। কোনো একটি বিশেষ সময় নয়। যেন অবিশ্রাম বয়ে যাওয়া মানব-নদীর যে-কোনো সময়ের, যে-কোনো এক ঘাটের বর্ণনা করছেন লেখক। যার একটির সঙ্গে অপরটির কোনো তফাত নেই। এই অর্থে বাংলাদেশের শক্তি-মান লেখক ইমদাদুল হক মিলনের "রূপনগর" উপন্যাসটি সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষের সমাজ-জীবনের এক আন্তরিক দলিল। আবার এই কারণেই

বাবা বাগেশ্বরের ঘোড়া—সুশীল সিংহ। শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৯। আঠারো টাকা।

সাহু আলির নিজের জমি—আফসার আমেদ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩। পঁচিশ টাকা।

রূপনগর—ইমদাদুল হক মিলন। অক্ষর, ঢাকা, বাংলাদেশ। চুয়ান্ন টাকা।

ভূমিপুত্র—ইমদাদুল হক মিলন। পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ। সাঁইত্রিশ টাকা।

একটি অবধারিত মৃত্যুর ধারাবিবরণী—মোহিত রায়। দিগঙ্গন প্রকাশনা, নতুন দিল্লী। দশ টাকা।

এ-উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা দর্শন কোনো-কিছুই মৌলিক নয়, জটিল নয়। সবই পাঠকের জানা। উপন্যাসের মধ্যেও কোনো জ্বালা নেই, যন্ত্রণা হয়তো আছে। আছে নানা ধরনের মানুষ, বিচিত্র তাদের জীবনযাপন, কষ্ট, লোভ, শোক এবং পবিত্রতা। ওবাদের মতো নিরীহ, গৃহকাতর মানুষ আর তার স্ত্রী লালীর স্নেহময় রূপটি শুধু উপন্যাসেরই রিলিফের কাজ করে নি, এরকম মানুষেরা আছে বলেই সমাজ-জীবন এত মধুর আকর্ষণীয়। তবু নেপালের মতো উদাসী চরিত্রকে বেঁধে রাখা যায় না। গাছের ফুল গাছেই সুন্দর। তাকে ছিঁড়ে এনে বেশিদিন ঘরে ফুলদানিতে রাখা সম্ভব নয়। যে ক-দিন রাখা যাবে তাতেই সন্তুষ্ট হতে হবে। নেপালেরা তাই বার-বার ঘর পালায়। তবু যেখানেই যাক রূপনগরের মতো আমরাও বলব—দুনিয়ার যেখানেই থাক, সুখে থেকো বাছা। ভালো থেকো।

ইমদাদুল হক মিলন শুধু একজন সু-কাহিনীকার নন, ভাষা সম্পর্কেও সজাগ লেখক। কথ্যভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করে তোলার মতো এক ধরনের সহজাত ক্ষমতারও অধিকারী। "ভূমিপুত্র" উপন্যাসের মুখবন্ধে লেখক যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি সফলভাবেই উত্তীর্ণ।

"ভূমিপুত্র" উপন্যাসটির নামের মধ্যেই এর আখ্যানটির পরিচয় দেওয়া আছে। এককালের জমির মালিক বেলদারেরা অবস্থার ফেরে পড়ে আজ বেপারি-দের জন-মজুর। তাদের ঘরের মেয়েদের উপরও চলে জোরজুলুম। এর কোনো প্রতিবাদ নেই। বেলদারেরা এ নিয়ম মেনে নিয়েছে। অবশেষে প্রতিবাদ এল বেলদারদের মেয়ে আতবি আর কুদ্দুস বেপারির অবৈধ সন্তান বাদলের কাছ থেকে। মা-মরা বাদল মামা কাদেরের মাছ মারার জন্য নৌকো বাইবার অধিকার আদায় করে আনল কুদ্দুস বেপারির কাছ থেকে। ভাগের কাছ থেকে কাদের শিখল প্রতিবাদের ভাষা। কাদেরের কাছ থেকে শিখল বেলদাররা। বাদলের মৃত্যুর পর তার জ্বালিয়ে-দেওয়া মশাল হাতে নিয়ে বেলদারদের ভূমি-দখলের লড়াইতে শহীদ হল কাদের। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই হল শুরু। শত-শত বাদল জন্ম নিয়েছে বেলদারদের ঘরে। প্রতি-বাদ আসবেই। আসছে। উপন্যাসের আখ্যানটি মোটা দাগের হলেও ভাষা আর ভঙ্গির জন্যে পাঠক শেষ পর্যন্ত নিবিষ্ট না থেকে পারেন না। এইখানেই লেখকের সার্থকতা। ইমদাদুল হক মিলনের ছটি বইয়েরই প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জার বিশেষ প্রশংসা করতেই হয়। বাংলাদেশে প্রকাশিত বাঙলা বইয়ের মুদ্রণসৌকর্যের এই মান আমাদেরও গর্বিত করে।

মোহিত রায়ের "একটি অবধারিত মৃত্যুর ধারা-বিবরণী"কে উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা আসলে উপন্যাসোপম বড়ো গল্প বলেও মনে হতে পারে। কাহিনীটি সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের অসফলতার পরবর্তী পর্যায়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বিতীয় বারের ভুলের একটি দিক নিয়ে গড়ে উঠেছে। সেই অর্থে এটি গল্পের আকারে গড়া এক রাজনৈতিক প্রতিবেদন।

'দাদারা হেরে গিয়েছিল কিন্তু ধাপ্পাবাজি করে নি, মানুষের লড়াইকে গড়ে তুলতে পারে নি, কিন্তু সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে সংগ্রামকে দান-খয়রাতির গোলক-ধাঁধায় নিয়ে যায় নি, রামু গ্রাম ছেড়েছে কিন্তু আবার ফিরে যেতে চায়, সত্যকে চাপা দেবার প্রক্রিয়ায় জড়ায় না যেখানে ভজনকুমার, গুজর পঞ্চায়েত, ঠিকাদার সবাই অটুট থাকে শুধু তাদের পিছনে রেখে কেউ কিছু লোককে অ আ ক খ শেখাবে, কিছু চিকিৎসার সুযোগ, সেলাইকল তার সাথে দীনেশের বিদেশভ্রমণ।' আর এভাবেই জনকল্যাণের মোহের লোভ দেখিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদেরও খাঁচায় পুরে রাখা। আসলে সেবার নেতৃত্বটাও যেন নিজেদের হাতে থাকে। খাদান শ্রমিক সঙ্ঘের স্পর্ধা তারা মানবে কেন? আর এই দ্বন্দ্বের মাঝে এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র দীপু লক্ষ করে কী অবধারিতভাবে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। সে এই মায়াজাল কেটে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু চক্রান্তের পরিধি আরও ব্যাপক। অতএব তাকে মুখোমুখী হতে হয় দৈহিক মৃত্যুর। সমগ্র ঘটনাটি দীপুর মৃত্যুর পরে তার এক শুভানুধ্যায়ীর ঘটনার অনুসন্ধান এবং ওই ভিত্তিতে রিপোর্টাজের আকারে লেখা। যার শেষ হয়েছে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের লেখা "কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার" (১৮৭২) পুস্তিকার রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র থেকে নেওয়া অংশের উদ্ধৃতি তুলে। প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এই বলে যে, নিছক রাজনৈতিক কোনো সংস্কারে নয়, অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার, অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনেই তাদের সুবিধা হতে পারে।...অর্থাৎ এহেন সংস্কার যা পুঁজি ও মজুরি শ্রমের সম্পর্কটাকে কোনোদিকেই আঘাত করে না...।' বলা বাহুল্য নিছক সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসের চেয়ে এ লেখায় রাজনৈতিক বক্তব্য রাখাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি সেটিই করেছেন পরম নিষ্ঠায়।

'পক্ষ বিপক্ষ'-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে

দীপংকর চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য সামাজিক দলিল, বাস্তবকে বোঝার মাধ্যম এবং বিনোদনের উপায়। সামাজিক উন্নতিতে সাহিত্যের ভূমিকা মার্কসীয় তত্ত্বে স্বীকৃত হলেও অর্থ-নৈতিক উন্নতিতে সাহিত্যের ভূমিকা আজও সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয় নি। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে-সাথে সাহিত্যের বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গি পালটে যায়। আমেরিকার অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা সাহিত্যকে অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হিসাবে মনে করেন। যদিও সাহিত্য ঠিক কত শতাংশ প্রভাব ফেলে তা আজও নির্দিষ্ট হয় নি। আমাদের দেশে সাহিত্য, বিজ্ঞান আর কারিগরি বিদ্যার মতোই আনডার ডেভেলাপড—আনডেভেলাপড নয়। তাই আমাদের দেশে প্রায়শ সাহিত্যের ভূমিকা কালক্ষেপণের উপায় হিসাবে মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে। বাস্তবকে বোঝার ভূমিকা কদাচিৎ পালন করে; উন্নতির সহায়কের ভূমিকা পালন অনেক দূরের প্রশ্ন। সাহিত্যের এই আনডারডেভেলাপড অবস্থা আমাদের সমাজের অন্যান্য বিষয়ের আনডারডেভেলাপড অবস্থার সাথে জড়িত এবং বিষয়গুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে আনডার-ডেভেলাপড রাখা হয়েছে। বাবু কালচার, উচ্চবিত্তের কল্পিত বেদনা, শূন্যতাবোধ সাধারণভাবে আমাদের লেখকদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু। যখন কোনো সাহিত্য-কর্ম অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নতির সাথে-সাথে পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে তখন সাহিত্য হয়ে যায় সমাজবিজ্ঞানের একটা অংশ। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের "পক্ষ বিপক্ষ" উপন্যাস এমনই এক সমাজবিজ্ঞানের অংশ। যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা সাহিত্যকে উন্নতির সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক সাহিত্যকর্ম ছাড়া তাঁদের প্রায় সব সাহিত্যকাহিনীতেই আবদ্ধ রয়ে গেছে, সাহিত্য হয়ে ওঠে নি। পক্ষ-বিপক্ষ উন্নতির সহায়কের ভূমিকা পালনে সক্ষম কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যের নিয়ম মেনে এবং শিল্পের নীতি মেনে। কাহিনীর দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে, রসের দিক থেকে এবং সর্বোপরি পরিবেশনের দিক থেকে "পক্ষ বিপক্ষ" একটি আর্থ-সামাজিক উপন্যাস।

বাঙলা সাহিত্যের সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক উপন্যাস থেকে আমরা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক চালচিত্র পাই। কিন্তু আর্থ-সামাজিক উপন্যাস বাঙলা ভাষায় বিরল। "পক্ষ বিপক্ষ"কে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে

পক্ষ বিপক্ষ—সাধন চট্টোপাধ্যায়। প্রমা ১৯৮৮। কুড়ি টাকা।

রাজনৈতিক উপন্যাস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি আর্থ-সামাজিক উপন্যাস। পশ্চিম বাঙলার বর্তমান গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে রাজনীতি আজ মুখ্য চরিত্র। সেই হিরোকে বাদ দিয়ে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের চালচিত্র পাওয়া শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অসম্ভব। তাই রাজনীতি "পক্ষ বিপক্ষে" সবসময় উপস্থিত থাকলেও "পক্ষ বিপক্ষ" রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। যদিও উপন্যাসের আরম্ভেই আছে বাম-রাজনৈতিক-দলভুক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলপ্রধানের সাথে বাম-রাজনৈতিক-দলভুক্ত বঞ্চিতদের কৃষিঋণ নিয়ে বিবাদ। এ বিবাদ যত না রাজনৈতিক তার অনেক-গুণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক। কৃষি-উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন গ্রামবাঙলায় ঘটে গেছে। কৃষি উৎপাদন 'বেঁচে থাকার স্তর' থেকে 'বাজারমুখী' উৎপাদন স্তরে চলে এসেছে। ফলে জমির মতোই ঋণ, জল, সার প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। কৃষিনির্ভর গ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই জল নিয়ে, ঋণ নিয়ে, সার নিয়ে গ্রামের ক্ষমতার কাঠামোতে জোর লড়াই আরম্ভ হয়েছে। এই লড়াই বাম রাজনীতির ব্যাপক সম্প্রসারণ সত্ত্বেও স্তিমিত হয় নি, বরং এই পরিবর্তন বাম রাজনৈতিক দলেও সুবিধাপ্রাপ্ত ও বঞ্চিতের দল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যে পরিবর্তন ব্যাপক হয়েছে, তা হল বঞ্চিতদের রাজনৈতিক শুরুত্ব বেড়েছে। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য আগের মতো থাকলেও রাজনৈতিক চিত্রপট পালটে গেছে। গ্রামের আগের অর্থনৈতিক ক্ষমতাবানেরা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বজায় রেখেছে তাদের চারিদিকে একদল তাঁবেদার তৈরি করে, যারা বাম রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়েছে কিন্তু বাম রাজনৈতিক দর্শনকে স্বীকার না করে, বিশ্বাস না করে। এই ক্ষমতাবানেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে বলশালী; তাঁবেদাররা রাজনৈতিক দিক থেকে বলশালী, কারণ গ্রামের নিরন্ন বঞ্চিতদের মধ্যে এদের প্রভাব কাজ করে। এই আর্থ-সামাজিক চালচিত্র, ক্ষমতার বিন্যাস "পক্ষ বিপক্ষে" দলিল হিসাবে লেখক উপস্থিত করেছেন মণ্ডলবাড়িকে কেন্দ্র করে। মণ্ডল-বাড়ি অর্থনৈতিক ক্ষমতা বজায় রেখেছে বাম দলে নাম লিখিয়ে; রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব ফেলছে বাদল ডাক্তারের মতো তাঁবেদারদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে। মণ্ডলবাড়ি তাদের এই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে তাদের বাড়ির বিধবা মেয়ের সাথে বাদল ডাক্তারের অসামাজিক যৌন সম্পর্ক পর্যন্ত মেনে নিয়েছে।

উপন্যাসের নায়িকা দুলালী তার বিধবা মায়ের এই অসামাজিক সম্পর্ক এবং মামাদের সংসারে বিনে-পয়সার কাজের লোকের ভূমিকা মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু দুলালী আবার বিদ্রোহও করতে পারছে না কারণ সে মামার বাড়িতে মানুষ, মামাদের কল্যাণে স্কুলে চাকরি পেয়েছে। দুলালীর ক্ষোভ, বেদনা তাকে অতীতের লড়াইয়ের নায়ক গগন ভাংগির ছেলে গোকুলের কাছাকাছি এনেছে। যদিও দুজনেই বাম-সুবিধাপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে তাই রাজনৈতিকগতভাবে তারা বিপক্ষে, কিন্তু দুজনেই পরিবর্তন চায় এই পরিবেশের মধ্যেই। দুলালী ও গোকুল লড়াই চালাতে-চালাতেস্বাভাবিকভাবেই পরস্পর-পরস্পরকে ভালোবাসে কিন্তু দুলালীর শিক্ষা এবং উঁচুজাতের অহং আর গোকুলের অশিক্ষা এবং নীচুজাতের হীনম্মন্যতা ভালোবাসার বীজকে বাড়তে দিল না। বাম-রাজনীতিতে, বাম-আদর্শের জীবনে তাই আজ পক্ষ বিপক্ষে-র দ্বন্দ্ব। গ্রামের জীবনের বিভিন্ন স্তরে আজ পক্ষ বিপক্ষের দ্বন্দ্ব। এই নিয়েই "পক্ষ বিপক্ষ"। কাহিনীর দিক থেকে, পরিবেশনার দৃষ্টিকোণ থেকে, ভাষার এবং শিল্পের দিক থেকে "পক্ষ বিপক্ষ" সম্পূর্ণ আর্থ-সামাজিক উপন্যাস। যৌন দৃশ্যও সামাজিক দ্বন্দ্বের কত সুন্দর পরিচয় দিতে পারে তার উদাহরণ পক্ষ-বিপক্ষে আছে। গোকুল দুলালীর প্রতি দুবার আকৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু গোকুল দুলালীকে তার 'পার্টনার' হিসাবে ভাবতে পারছে না, কারণ তার অশিক্ষা ও নীচুজাতের হীনম্মন্যতা কাজ করেছে। এটা আবার প্রমাণ করল যৌন সম্পর্ক শুধু দেহজ নয়, মনেরও বটে। দুলালী ও গোকুলের সম্পর্ক সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছে। বাদল ডাক্তার বর্তমান গ্রামের জীবনের সুবিধাভোগীদের প্রতিভূ, মণ্ডলবাড়ির ঘটনা প্রমাণ করে বাম-দর্শনবিহীন রাজনীতি আজ শুধু রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার।

"পক্ষ বিপক্ষে"-র বিপক্ষেও কিছু বলার আছে। প্রথমত, পঞ্চায়েতে 'ওয়ার্ড' হয় না, বোর্ড মিটিং হয় না; হয় গ্রামসভা এবং পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং। দ্বিতীয়ত বাদল কর্মকার এবং গোকুল দুজনই বাম-দলের জেলা নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে নমিনেশন পেল না, পেল মণ্ডলবাড়ির ছেলে উৎপল, পরে সে অঞ্চলপ্রধান হল। বাদল ডাক্তারকে বাদ দিয়ে লেখক জেলা নেতৃত্বকে যতটা নিষ্কলঙ্ক দেখাতে চেয়েছেন, বাস্তবে কি তা সত্য? বোধহয় লেখকের বাম-নেতৃত্বের প্রতি এখনও আস্থা আছে। তৃতীয়ত, গগন ভাংগির লড়াইয়ের ইতিহাস বর্ণনার জায়গাটা একটু 'ফ্ল্যাট', সুতরাং কাহিনীর পরিবেশন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। যদিও নব্বই শতাংশ স্বাভাবিক, তবে রসের আস্বাদন তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। 'ফ্ল্যাট' ভাবটা একটু মনে হবার কারণ গল্পের প্রথম দিকটা খুব বেশি গতিযুক্ত। চতুর্থত, শেষ অংশটা না থাকলেও উপন্যাসের ক্ষতি হত না।

'মাছের প্রসঙ্গ উঠলে বাঙালিকে থামানো মুশকিল'

যেমন বাঙালি বলতেই মাছ আর রসোগোল্লার কথা মনে আসে, তেমনই কলকাতার সম্বন্ধে বলতে গেলেই দুজন রাধার কথা মনে পড়ে—রাধারমণ মিত্র আর রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। অবশ্য আমাদের আলোচ্য বইখানি কলকাতা সম্পর্কিত নয়, কিন্তু মৎস্যপ্রিয় বাঙালির সেরা তীর্থ কলকাতা আর কলকাতার বিশেষজ্ঞ হলেন এই দুজন রাধাবাবু। রাধাপ্রসাদ অবশ্য আরও দুটি নামে পরিচিত—আরপি এবং শাঁটুল। এই যে "মাছ আর বাঙালি" নামক একটি বইয়ের আলোচনা শুরু করেই আলোচ্য বইয়ের প্রসঙ্গ থেকে রাধারমণ মিত্র, কলকাতা, রসোগোল্লা প্রভৃতি প্রসঙ্গে চলে গেলাম এটি কঠোর-মনোভাবাপন্ন সমালোচকদের চোখে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা বলে মনে হবে। কিন্তু রচনার ব্যাপারে "অনুষঙ্গ" বলে একটা বিষয় আছে এবং আলোচ্য গ্রন্থে অনুষঙ্গের আনন্দিত বিস্তারে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে বিচরণের প্রীতিকর নিদর্শন প্রচুর।

এক ধরনের বই আছে যার শুরু থেকে আস্তে-আস্তে অর্থাৎ পরম্পরা মেনে শেষের দিকে এগোতে হয়। এটি বলে রাখা ভালো যে "মাছ আর বাঙালি" একেবারেই ভিন্ন জাতের বই। যুক্তির পরম্পরা মেনে বক্তব্যের প্রাসাদ গড়ে তোলেন নি রাধাপ্রসাদ, কোনো অদৃশ্য সূত্রের অনুষঙ্গের গ্রন্থনে তিনি বহু-বিচিত্র পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য ও তথ্যগুলি জাপানি ফুল-সজ্জার ভঙ্গিতে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেই অদৃশ্য সূত্রটাকে এক কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই সহজ-বোধ্য করে বলতে পারি তা এক অধীত, বিদগ্ধ, রসিক, বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞায় সমৃদ্ধ, সংস্কৃত ও স্পর্শচেতন মন এবং এই মনেরই চমৎকৃত ও সমুজ্জ্বল প্রকাশ আলোচ্য বইয়ের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায়। ফলে মলাট খুলে যে-কোনো পাতা থেকেই বইটি পড়া যায়, প্রত্যেক পাতায় হয় অতীতের জন্যে মন-কেমন-করার নানা ইঙ্গিত নতুবা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতি-জাগানো কোনো উল্লেখ কিংবা কোনো কঠিন জ্ঞানের বিষয়ের উপর

মাছ আর বাঙালি—রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা-৯। মূল্য পঁচিশ টাকা।

আকস্মিক কৌতুক-কিরণের প্রক্ষেপ। 'মাছ আর বাঙালি', 'বাঙালির শীতের বিলাস' আর 'ভারতে আসবের ত্রিধারা।'

লেখকের অধ্যয়নের ব্যাপ্তির কথা আগেই বলেছি, বলা হয়নি যে তাঁর সেই অধীত বিদ্যা কখনও পাঠকের কাঁধের উপর ভার হয়ে বসে না, কিন্তু মূল রচনা বা উৎসগ্রন্থগুলো পড়ে দেখার জন্যে একটা অহেতুক গোপন কৌতূহল জাগিয়ে দেয়। শুধু প্লেটো বা বিবেকানন্দ নন, একেবারে পাঁজির বিজ্ঞাপন ও বটতলার সাহিত্য পর্যন্ত লেখকের স্বচ্ছন্দ ও সরল বিবরণ। পাঠকের অজ্ঞাতেই শুরু হয়ে যায় তার সমাজবিজ্ঞান-চর্চা। আর যাঁরা জীবনের অনেকখানি সময় ব্যয় করেন আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত রান্নাবান্নার মতে ইহলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তাঁদের জন্যে রাধাপ্রসাদ উপহার দিয়েছেন বিবেকানন্দের অমূল্য মন্তব্য: ভাল রাঁধতে পারলে ভালো সাধু হওয়া যায় না। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে এ-বইয়ে লেখক অজস্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এসব উদ্ধৃতি ও প্রসঙ্গ থেকে আমরা মধ্যে-মধ্যে বহু বরেণ্য ব্যক্তির মহার্ঘ সঙ্গ লাভ করি। এটি এ বই পড়ার একটা বড়ো লাভ।

এ বইয়ে "মাছ আর বাঙালি" ছাড়াও আছে 'বাঙালির শীতের বিলাস' আর 'ভারতে আসবের ত্রিধারা' নামে মোট তিনটি প্রবন্ধ। নাম তিনটি, কিন্তু তিনটি নামের পেছনে একটাই মন। মনটি অবশ্যই মৎস্যপ্রিয়। মাছের প্রসঙ্গ উঠলে বাঙালিকে থামানো মুশকিল। "মাছ আর বাঙালি" গ্রন্থের আলোচনাও দেখছি ক্রমশই বড়ো হয়ে যাচ্ছে। এটা এ বইয়ের একটা দোষ। এই প্রসঙ্গে বলতে শুরু করলে বলা শেষ হতে চায় না। এবার থামা উচিত। থামার আগে বইটির প্রোডাকশন সম্বন্ধে বলি। প্রথমত বইটি সংগ্রহে রাখার মতো প্রচুর ছবিতে ভর্তি। ছবির বই হিসেবে এটা একখানি মূল্যবান বই। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার তো বটেই, পংক্তি-বিন্যাস, চিত্রবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা বইটিকে মুদ্রণ ও প্রকাশন শিল্পের এক গৌরবময় নিদর্শন করেছে।

মঞ্জু দাশগুপ্ত ও সুরজিৎ দাশগুপ্ত

কলকাতায় ফারসি চর্চা

ড. আব্দুস সোবহান

ফারসি চর্চার সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা আর সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে এক আকর্ষণীয় অধ্যায়। এদেশের উত্তর আর পশ্চিম অঞ্চল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের গোড়া থেকেই ইরানীয় ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল। সেখানে কলকাতার সঙ্গে সে ভাষার পরিচয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের পূর্বে গড়ে ওঠে নি—যখন ইংরেজ বণিকরা পূর্ব ভারতে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদে স্বাধীন নিজামত প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কলকাতা নগরীর বিকাশ এক সমকালীন ঘটনা। ইতিমধ্যে ফারসি-ভাষী মুসলমান শাসকরা যে ভাষা আর সংস্কৃতি এ-দেশে নিয়ে এসেছিলেন, তা এ রাজ্যের ভাষা, সমাজ এবং রীতিনীতির মর্মমূলে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতবর্ষের বিপর্যয়ের পর অবস্থাটা সম্পূর্ণ বদলে গেল, এবং পরবর্তী কালে সমস্ত পথই মহানগরীর দিকে ধাবিত হল। তারপর থেকে কলকাতা মহানগরী ব্যবসায়ী, কর্মসন্ধানী, অভিজাত সম্প্রদায় আর তার অনুগামী দল—সকলেরই মিলনভূমিতে পরিণত হল। নতুন শাসকেরা আন্তরিকভাবেই শাসনকার্যের সুবিধার জন্য যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কে শাসিতদের কাছ থেকেই অবহিত হতে চাইল, এবং সেটা তখন ফারসি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফলে ফারসি ভাষার প্রসারের পক্ষে এক চমৎকার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন; এর ফলে ব্রিটিশ ভারতে সুসংবদ্ধভাবে ফারসি শিক্ষার প্রতি উৎসাহপ্রদর্শনের সূচনা হল। যদিও উর্দু ভাষাই—যাকে ইউরোপীয়রা

"হিন্দুস্থানি" বলে অভিহিত করতেন—ক্রমশ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে লাগল, তবু ফারসিরই এ বিষয়ে অগ্রাধিকার ছিল। যে ইংরাজ শাসকেরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নির্বিঘ্নে এবং নিপুণভাবে পরিবর্তন ঘটাতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের নিকট ফারসি ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ড. জন বোর্থউইক গিলক্রাইস্ট ছিলেন একজন তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত। তিনিই এদেশে ব্রিটিশ অফিসারদের ফারসি আর উরদু শেখানোর জন্য কলকাতা মহানগরীতে খ্যাতনামা কবিলেখকদের এক উজ্জ্বল সমাবেশ ঘটানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই খ্যাতনামা পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন মীর আম্মান, হাফিজউদ্দিন আহম্মদ, শের আলি আফসুস, হায়দার বখ্শ হায়দারী, মীর বাহাদুর আলি হুসাইনী, কাজিম আলি জওয়ান, মৌলভী একরাম আলি, এবং মীর্জা আলি লুত্ফ্। বহু ফারসি রচনা উরদুতে ভাষান্তরিত হয় এবং তা থেকে আবার ইংরাজিতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "চাহার দরবেশ", "তারিখ-ই-জাহানওয়া-ই-নাদিরী", "তুতীনামা", "এয়ার-ই-দানিশ" এবং "গুলিস্তান"। এই-সমস্ত ফারসি চিরায়ত সাহিত্যের অনুবাদ ঘটনাক্রমে উরদু গদ্যসাহিত্যের গোড়াপত্তন সূচিত করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফারসি বিভাগের মুনশীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। যেমন, প্রধান মুনশী মৌলভী ইলাহ্দাদ লখনউ থেকে, এবং তাঁর অধস্তন মুনশীরা, যথা, বদরআলি, করম হুসেন এবং নজরুল্লাহ যথাক্রমে মুজফফরপুর, অযোধ্যা এবং মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ছিলেন।

ফারসি বিভাগ ছিল এই কলেজের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন অংশ। এখানে ফারসি কবিতার সূক্ষ্মতার দিক নিয়ে শিক্ষকমণ্ডলী আর ছাত্ররা বিশেষ সাগ্রহে আলোচনা করতেন। শেখ সাদী রচিত "গুলিস্তান" ও "বুস্তান" প্রভৃতি চিরায়ত ফারসি সাহিত্যের নির্বাচিত অংশসহ ফারসি গদ্য ও কবিতার বিবিধ সংগ্রহ নিয়ে ১৮০৯-১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফারসি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় ছয় খণ্ডের এক সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৮১১ সালে ফেরদৌসী-রচিত "শাহনামা" এবং ১৮১২ সালে নিজামী গঞ্জাভী-রচিত "সিকান্দারনামা" প্রকাশিত হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুনশীরা যৌথ উদ্যোগে "শামসুল লোগাত" নামে আরবি ফারসি ভাষার এক দ্বিভাষিক অভিধান প্রণয়ন করেন, এবং তাঁর দু বছর বাদে সনাতন আরবি অভিধানবিদ্যার ভিত্তিতে ফারসি অনুবাদসহ "মুনতাখাবুল লোগাত" নামে এক অভিধান প্রণীত হয়। ওই কলেজের ফারসির অধ্যাপক ফ্রানসিস গ্ল্যাডউইন দুটি প্রাথমিক মানের ফারসি ব্যাকরণ রচনা করেন—একটির নাম হল "পারসিয়ান গাইড" এবং অন্যটি হল "পারসিয়ান মুনশী"। ক্যাপটেন রোবাক কিছু-দিনের জন্য কলেজের সচিবরূপে কাজ করেছিলেন। তিনি কলেজের ভারতীয় সহকর্মীদের সহায়তায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ফারসি অভিধান "বুরহান-ই-কাতি" প্রকাশ করেন। বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা এই কলেজে ফারসি ভাষা আর সাহিত্যের প্রচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক গৌরবময় ভূমিকার অধিকারী হলেন তারিণীচরণ মিত্র। তিনি নিজে ফারসি ভাষায় সুকুমার সাহিত্য সংকলন ও প্রকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পর কলকাতার ফারসি চর্চার পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। জ্ঞানান্বেষণের মূর্ত বিগ্রহ, প্রাচ্যবিদ্যার মধ্যমণি স্যার উইলিয়াম জোন্স-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই সোসাইটি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রতিষ্ঠান বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপিতে সমৃদ্ধ। পাণ্ডুলিপিগুলিতে অসংখ্য অনালোচিত গবেষণার বিষয় নিহিত ছিল। এইসব দিক দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি দেশে-বিদেশে ফারসি পণ্ডিতগণের কাছে অনন্ত আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দুরূপে বিরাজিত ছিল। এক্ষেত্রে জোন্স্ নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর "পারসিয়ান গ্রামার" এ-যাবৎ লিখিত সমস্ত প্রাচ্য-সাহিত্যের এক শক্তিশালী নিদর্শন। তাঁর "পারসিয়ান সং অব হাফিজ" অধ্যাপক আরবেরীর ভাষায় "ফারসি চর্চার বিকাশে" এবং অনুকরণের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমূহের পরীক্ষার ক্ষেত্রে সোসাইটি এক পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ফারসি ভাষা আর সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং ইসমাইলি ধর্মমত বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তাত্ত্বিক ভ্লাদিমির ইভানভ (মৃত্যু—১৯৭০) হলেন সেই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের সর্বশেষ প্রতিনিধি যাঁরা তাঁদের জীবনের অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেছেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৯০৭-০৯) ও (১৯২১-২৩) ছিলেন। তিনি ইভানভকে ফারসি পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকা প্রণয়নের জন্য নিয়োজিত করেন। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত ইভানভের "ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগস্ অব পারসিয়ান ম্যান্যুসক্রিপটস্ অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" ফারসি ভাষার হস্তলিখিত পুঁথিসমূহকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক উচ্চ-মানের স্বাক্ষর রেখেছে। যে-কোনো দেশের ফারসি চর্চার যে-কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপৃত গবেষকের নিকট এই গ্রন্থটি এক অপরিহার্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। এ ছাড়াও, সোসাইটির গৌরবময় প্রকাশনার কৃতিত্বের তালিকায় বিরল মূল্যের অধিকারী ফারসি অন্যান্য গ্রন্থাবলী। সোসাইটির বিখ্যাত "বিবলিওথিকা ইনডিকা" সিরিজ আজ পর্যন্ত প্রায় একশত ইতিহাস, জীবনী, ভূগোল, সাহিত্যসমালোচনা সম্পর্কিত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় প্রকাশ করেছে। "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী", "তারিখ-ই-মাসুদী", "তারিখ-ই-নাসিরী", "মুনতাখাব উত্ তাওয়ারিখ", "ইকবাল নামাই-জাহাঙ্গীরী", "বাদশাহ নামা", আলমগীরনামা" প্রভৃতি ভারত-ইতিহাস-বিষয়ক যুগান্তকারী প্রকাশন এদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাস সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছাড়া, বৃহত্তর পাঠক-সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সোসাইটি এই-সমস্ত মূল গ্রন্থের কয়েকটি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। পারস্যের পাণ্ডিত্য বিষয়ে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধ সোসাইটির প্রখ্যাত জর্নালকে শোভিত করেছে। এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব অম্লান। এগুলি অমূল্য সঞ্চয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোনসের পর সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন স্যার জন শোর (১৭৫১-১৮৩৪)। তাঁর ফারসি-জ্ঞান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

তিনি এই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং শীর্ষস্থানীয় ফারসি কবিদের কবিতা স্বচ্ছন্দে আবৃত্তি করতে পারতেন। লেফটেন্যানট কর্নেল জেমস্ সিকমার (১৭৭৮-১৮৪১) নামক এক দুঃসাহসী সামরিক কর্মী কলকাতাস্থ এক মুদ্রণসংস্থার শিক্ষানবিশ হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি উৎকৃষ্ট ফারসি ভাষায় লিখিত এক দিনলিপি রেখে গেছেন। কলকাতার ইয়ং বেঙ্গলদের গুরু, এক সময়ে হিন্দু স্কুলের সহকারী শিক্ষক হেনরি লুই ডিরোজিও ছিলেন একজন প্রখ্যাত কবি। তিনি হাফিজের কিছু কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করেন।

কলিকাতা মাদ্রাসা

অগলয়েস স্প্রেঙ্গোর (১৮১৩-১৮৯৩), উইলিয়াম নাসাও লীজ (১৮২৫-১৮৮৯) এবং হেনরি ফার্দিনানদ

ব্লকম্যান (১৮৩৮-১৮৭৮) ভারতবর্ষে ইসলামি শিক্ষার মুখ্য পীঠস্থান কলকাতা মাদ্রাসার সঙ্গে ১৮৫০-১৮৭৮ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত ছিলেন। কিছুদিনের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সচিব এবং সরকারের ফারসি অনুবাদক হিসাবে স্প্রেঙ্গোর মূল্যবান ফারসি গ্রন্থের সম্পাদনা ও তালিকাবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সৈনিক পণ্ডিত লীজ বেশ কয়েক বৎসর ধরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরীক্ষকমণ্ডলীর সম্পাদক এবং সরকারের ফারসি অনুবাদক ছিলেন। ব্লকম্যান তাঁর অক্লান্ত গবেষণা এবং বিরাট পাণ্ডিত্যের দ্বারা এমন এক মান সৃষ্টি করেছিলেন যা আজও গবেষকদের উৎসাহিত করে। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের পত্রিকায় তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। এগুলি মূল্যবান রচনা, যা আজও গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে ২০০ বছরের প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত এই কলকাতা মাদ্রাসা এই শহরের ফারসি শিক্ষার প্রসারে এক প্রশংসনীয় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

মোল্লা মাজহুদ্দিন, মওলানা মহম্মদ ওয়াজিহ্, মৌলভী ইলাহদাদ্, মৌলভী আব্দুল হক হাক্কানী, মৌলভী আব্দুল রহীম সাফপুরী, মৌলভী লুৎফর রহমান বর্ধমানী, মৌলভী ইসহাক বর্ধমানী, আগা আহম্মদ আলি, মৌলানা শফিউল্লাহ সরহিন্দী, মৌলানা বিলায়েত হোসেন, মৌলানা জাফর আহমদ উসমানী, মৌলানা আব্দুল হুফ্ফাজ, আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগাড়ী প্রমুখ মাদ্রাসার অতীতের কিছু নামকরা শিক্ষক তাঁদের সমসাময়িক কালের ফারসি ভাষার কবি আর লেখক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। আলিয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি রমজানিল মাদ্রাসার মতো তদানীন্তন কলকাতায় আরও কিছু সনাতন ধর্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল—যেখানে ছাত্রদের পাঠ্যসূচীতে ফারসি গদ্য আর কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার-অনুমোদিত মাদ্রাসা শিক্ষাপর্ষদ এই-সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল।

উরদু কবিতার জনক

উনবিংশ শতাব্দীর ফারসি সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রণী হলেন আবদুল গফুর নাস্‌সাখ। তিনি বঙ্গদেশের "উরদু" কবিতার জনক হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। উরদু আর ফারসি—দুই ভাষাতেই বহুপ্রসূ নাস্‌সাখ অসংখ্য ফারসি কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ ফারসি রচনার মধ্যে রয়েছে চতুষ্পদী কবিতা-সংগ্রহ "মারগুব-ই-দিল"। ফরিদউদ্দিন আত্তারের "পান্দনামার" পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদ "চশমা-ই-ফয়েজ" নামক গ্রন্থ। ফারসি কবিদের রচনার চমৎকার সংকলনগ্রন্থ "কান্দ-ই-পার্সী" এবং সমসাময়িক ফারসি কবিদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ "তাজকিরাতুল মা-আসিরিন"। এই সময়ের অগ্রণী পণ্ডিত-দার্শনিক আবদুর রহিম গোরখপুরী তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য "দাহারী" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষার একজন নামকরা কবি ছিলেন। তা ছাড়া, তিনি বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় ফারসিতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন, "ফরহাঙ্গ-ই-দাবিস্তান" "পান্দনামা-ই-বাহরানী", "কারনামা-ই-হায়দারী" "হিকায়ত-ই-ইবরাত আয়াত" এবং "শিগারফ-ই-বায়ান ইবরাত তওয়ামানা"। আবদুর রহিম টিপু সুলতানের রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই পরিবারের প্রতিনিধি প্রিন্স বসীরুদ্দিন "তওফিক" এবং প্রিন্স আজীমুদ্দিন "সুলতান" স্বীকৃত মানের ফারসি কবি ছিলেন। আবদুর রহিমের এক ছাত্র উবায়দুল্লাহ উবায়দি সুরাহওরদী (১৮৩৪-১৮৫৫) ছিলেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং লেখক। তাঁর পাঁচ খণ্ডে প্রণীত "দস্তুর-ই-পার্সী আমুজ" ফারসিভাষা শিক্ষার্থীদের এক অতি জনপ্রিয় ফারসি ব্যাকরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। উবায়দীর ফারসি গ্রন্থ "দেওয়ান"-এ রয়েছে বহু উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা এবং শিল্পসুষমামণ্ডিত স্তুতিমূলক কবিতা, যা উবায়দীয় কাব্যপ্রতিভার ব্যাপকতর পরিচয় বহন করে। তদানীন্তন যুগের সর্বাপেক্ষা নামকরা ফারসি কবি 'আবুল মা'-আলি আবদুর রউফ ওয়াহিদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ফারসি সাপ্তাহিক পত্রিকা "দূরবীন"-এর সম্পাদকরূপেও উবায়দী কিছুদিন কাজ করেছিলেন। দিওয়ান ছাড়াও তিনি "তারিখ-ই-কলকাতা" নামে ফারসি ভাষায় কলকাতা নগরীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন। যাতে আছে এই শহরের প্রশংসার চমৎকার কবিতা।

আবদুল গফুর নাস্‌সাখের ব্যক্তিগত বন্ধু নাসিরুদ্দিন হায়দার সামী কলকাতা মাদ্রাসার প্রখ্যাত ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষাগুরু মোল্লা মুহম্মদ ওয়াজিহের প্রিয় ছাত্র হিসাবে অধিকাংশ সময় কলকাতা শহরে বসবাস করেন। তিনি ফারসি ভাষায় সিলেটের হজরত-শাহ-জালালের এক প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ "সুহাইল-ই-ইয়ামান"-এর রচয়িতা হিসাবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সামী অনুপ্রাণিত ফারসি কবিতা-সমূহের সংকলন করতেন, যাতে শৈল্পিক উৎকর্ষ চিহ্নিত ছিল। তিনি কলকাতা শহরের প্রশংসা করে আরবি-প্রভাবিত ফারসিতে এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই শহরের এক উল্লেখযোগ্য নাগরিক কুমিল্লার মুহাম্মদ আবদুর রহমান সাইদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ফারসি কবিতাসমূহের এক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। অন্য এক গজলে সাইদ্ এই শহরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা নিঃসৃত করেছেন।

তালতলা খানকাশরীফ

কলকাতার বিভিন্ন সুফি ধারার যে শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধি-বর্গ এবং আধ্যাত্মিক গুরুরা এই শহরের বৌদ্ধিক জীবনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন, ফারসি শিক্ষা সেই সুফি ধারার পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এর কোনো পূর্ব-দৃষ্টান্ত ছিল না। সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী শাহ ওয়াইসী (মানিকতলায় এঁর মাজার বর্তমান) ছিলেন একজন নামকরা উরদু ও ফারসি কবি। তিনি রুমী, খাকানী, হাফিজ, উরফী এবং ফৈজী প্রমুখ চিরায়ত ফারসি কবিদের ভাবধারায় বহু গীতিকবিতা রচনা করে। দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার ক্রিস্টোফার রোডে শাহ্ উবায়দুল্লাহ বাগদাদীর মাজার আছে। তিনি ফারসি ভাষার লেখক আর কবি ছিলেন। তাঁর এক আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী শাহ আবদুর রহমান "রহমান" এক ফারসি "দিওয়ান" সংকলন করেন। কিন্তু ফারসি চর্চা তথা কলকাতায় ইসলাম চর্চার যে সুফি ধারার বিশিষ্ট অবদান আছে, সেটি হল তালতলার খানকাহ্-ই-আলিয়াহ-ই কাদেরীয়া, যার সর্বোচ্চ তলায় একটি সুন্দর মসজিদ এবং সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আছে। কলকাতার এই সুফি ধারা হজরত গাওসুল আজম সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানীর প্রত্যক্ষ বংশধর হজরত সৈয়েদানা মওলানা সৈয়দশাহ্ মুরশিদ আলি আলকাদেরী আলবাগদাদী কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপিত হয়। একেশ্বরবাদ, মানবপ্রেম ও ভ্রাতৃত্বের সর্বজনীন ইসলামি শিক্ষার প্রচার ছাড়াও এই পবিত্র পুরুষ চোস্ত উরদু ও ফারসিতে কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখতেন, এবং অন্যকে দিয়ে অনুলিখন করাতেন। "জামাল" এবং "আসি" ছদ্মনামে রচিত তাঁর উরদু "দিওয়ান" ইসলামের গূঢ় রহস্যের এক সংকলন। রুমী, সাদী, হাফিজ প্রমুখ পারস্যের মহান সুফি কবিদের মরমি বাণীর ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষ করা যায় এই গ্রন্থে। বঙ্গদেশের এই প্রখ্যাত সুফি ধারার শাখা রয়েছে মেদিনীপুর এবং মঙ্গলকোটে (বর্ধমান)।

হিন্দু-মুসলিম আরো কিছু ফারসি পণ্ডিত লেখক এবং কবি জুলফিকার আলি "মাস্ত" নামে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার যুগের এক কবি কলকাতায় বেশ কয়েকবছর ধরে বসবাস করেছিলেন। তিনি "রিয়াজুল

রিফাক" (ঐক্যের উত্থান) শীর্ষক যে স্মৃতিকথা রচনা করেন তাতে কর্মের অন্বেষণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় আগত বেশ কিছু ফারসি কবি আর লেখকের উল্লেখ আছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন, যেমন মৌলভী নাজিমুদ্দিন আহম্মদ খান 'সাকিব' "শেখ দিলওয়ার আলি" দিল্, আবিদ আলি "আবিদ, সিরাজুদ্দিন আলি খান এবং আবদুল হাদি" "মুজতার" স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। জনৈক মির্জা-খলিলুল্লাহ খান 'সাফির' পারস্যের রাষ্ট্রদূতরূপে ব্রিটিশ ভারতের এই রাজধানীতে প্রথম যুগে এসেছিলেন এবং তাঁর কাব্যপ্রতিভা ও কাব্যপ্রীতি দ্বারা ভারতবর্ষের মুসলিম বিদ্বৎসমাজকে উদ্দীপিত করেছিলেন। মালিকুশ শুয়ারা মীর কামরুদ্দিন "মিন্নাত" নামে জন্মসূত্রে ইরানি এক ব্যক্তি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। নাসসাখের মতে, তিনি ছিলেন প্রচুর সাহিত্যকর্মের স্রষ্টা, এক লক্ষেরও অধিক কবিতা রচনার কৃতিত্ব ছিল তাঁর। দিয়ানাথ পণ্ডিত "রঙ্গীন" রতনলাল "গরীব" এবং মহারাজা কল্যাণসিং "আশিক" প্রমুখ ছিলেন কলকাতার কয়েকজন নামকরা অবাঙালি হিন্দু, ফারসি চর্চায় তাঁদের অবদানকে কোনোমতেই উপেক্ষা করা যায় না। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ফারসিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত হিন্দু সমাজসংস্কারক মহাপণ্ডিত রাজা রামমোহন রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধ্রুপদী ফারসিতে রচিত এবং আরবিতে ভূমিকাসহ তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "তুহফাতুল মুওয়াহহিদীন" ফারসি ভাষার উপর তাঁর অধিকারের পরিচয় বহন করে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা রাজা জন্মেজয় মিত্র ছিলেন উরদু-ফারসিতে সুপণ্ডিত। তিনি "নুসখা-ই-দিল-খুসা" এবং "মুনতাখাবাত তাজকিরা" নামে দুটি জীবনীগ্রন্থ সংকলন করেন। এতে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট মানের ফারসি কবির পরিচয় পাওয়া যায়। কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের নিকটও ফারসি ভাষা অপরিচিত ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফারসি মরমি কবিতার এমন এক আগ্রহী পাঠক ছিলেন তাঁকে সাধারণভাবে "হাফিজ-ই-হাফিজ" বলা হত। দিওয়ান-ই-হাফিজ ছিল তাঁর প্রিয় গ্রন্থ। তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বভাবতই পারস্যের কবি হাফিজের রহস্যবাদী দর্শনের গভীরে ডুব দেওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। ১৯৩২ সালে ইরানে অধিষ্ঠানকালে কবি তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভোলেন নি।

ফারসি সংবাদপত্র

ভারতবর্ষে ফারসি সংবাদপত্রের জন্মভূমি হিসাবে সমস্ত ফারসি ভাষাপ্রেমিক এই প্রাসাদনগরীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছে। দেশে মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন হওয়ায় দেশীয় ভাষাতে সাহিত্য ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। তখনও ইংরাজি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। আবার অন্যদিকে সংস্কৃতজাত দেশীয় ভাষাসমূহ সাংবাদিকতায় উপযোগী পারপক্কতা লাভ করে নি। সেই সময় ফারসিই ছিল অভিজাত মহলে এবং সাধারণ সমাজে একমাত্র জনপ্রিয় ভাষা প্রায় ১৮৩০ সাল অবধি এই ভাষাই ছিল কূটনৈতিক লেনদেন, প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিবেদনের একমাত্র মাধ্যম। প্রথম প্রকাশিত আটপৃষ্ঠার ফারসি পত্রিকা "জাম ই-জাহাঁনোমা (পৃথিবী-প্রদর্শনকারী পানপাত্র) কলকাতার এক ইংরাজ সওদাগরি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে মুন্সী লালা সদাসুখ, তারপরে মুন্সী হরিহর দত্ত এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হিন্দুস্তানি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালের ২৮শে মার্চ। কিন্তু দু-মাস পর সম্পূর্ণ ফারসিতে এর প্রকাশ হতে থাকে। এই পরিবর্তন লক্ষ করে ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় : 'হিন্দুস্তানি ভাষা হল শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের ভাষা, সাধারণ কথাবার্তায় তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লেখার ভাষা হিসাবে তা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। দেশওয়ালি জনগণের মধ্যে সংবাদপত্রের রুচিবোধ গড়ে ওঠে নি বললেই হয় ; তা কেবলমাত্র শিষ্টাচারসম্পন্ন শিক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং শুধুমাত্র হিন্দুস্তানিভাষী জনগণের নিকট দেশীয় সংবাদপত্র সমর্থন প্রত্যাশা করতে পারে না। তাই উন্নত পরিস্থিতিতে ফারসি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশকে অগ্রাধিকারদান স্বাভাবিক। কারণ যারা কিছুমাত্র মর্যাদার আসন পেতে চায় এমন প্রত্যেকের নিকট ফারসি ভাষা-শিক্ষার এক আবশ্যিক অঙ্গ।' সেই সময়ে ফারসি ভাষা কতখানি মহিমান্বিত মর্যাদায় আসীন ছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে এই উক্তির মাধ্যমে। ওই পত্রিকা সময়ান্তরে ফারসি কবিতা ও গজল প্রকাশ করত।

"জাম-ই-জাহাঁনোমার" পাশাপাশি "মিরাতুল আখবার" (সংবাদ-দর্পণ) নামে অন্য এক ফারসি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। এই সাপ্তাহিকের সংবাদ হিসাবে রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল প্রথম সংখ্যার প্রচারপত্রে ঘোষণা করেন ; 'যেহেতু ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষের সর্বত্র বোধগম্য নহে, এই ভাষার সঙ্গে অপরিচিত লোকেরা সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে চাইলে অন্য কোনো ভাষায় তা করতে হবে কিংবা সম্পূর্ণরূপে অবিদিত থাকতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি ফারসি ভাষায় একটি সংবাদ-সাপ্তাহিক প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। কারণ ফারসি ভাষা দেশীয় সমাজের সকল সম্ভ্রান্ত অংশের বোধগম্য ভাষা।' এই সাপ্তাহিক সাংবাদিকতার উচ্চমান বজায় রেখেছিল। তবে এর সাহসী এবং সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ভারপ্রাপ্ত গভর্নর-জেনারেল অ্যাডাম কর্তৃক ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ নতুন প্রেস অর্ডিনান্স পাশ হওয়ার ফলে একে মূল্য দিতে হয়েছিল, এর আয়ু ছিল স্বল্পস্থায়ী। এরপর থেকে যে-কোনো পত্রিকা প্রকাশনার জন্য অগ্রিম অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন হত। যে-সমস্ত ফারসি পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি লাভ করেছিল, তার মধ্যে মণিরাম ঠাকুর সম্পাদিত "শামসুল আখবর" (সংবাদসূর্য) জনৈক শেখ আলিমুল্লাহ কর্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদিত "সমাচার সুভ-রাজেন্দ্র" এবং তালতলা এলাকা থেকে জনৈক ওয়াহাজুদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত "মাহ-ই-আলম-আফরুজ" (জগৎ আলোকরা চন্দ্র) প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। মধ্য কলকাতা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রের মধ্যে তিনটি ফারসি সাপ্তাহিক "আয়না-ই-সিকেন্দার" (আলেকজান্দার দর্পণ) "সুলতানুল আখবার" (সংবাদের রাজা) এবং "মেহরে-ই মুনীর" (উজ্জ্বল সূর্য)-এর নাম করা যায়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার মেডিকেল কলেজ স্ট্রিট থেকে সৈয়দ জালালুদ্দিন কাশানী (মুইইদুল ইসলাম উপাধিপ্রাপ্ত) সম্পাদনায় "হবলুল মাতিন" নামে একটি শক্তিশালী, বৈপ্লবিক এবং সমৃদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রভূত মর্যাদা এবং ব্যাপক প্রচারসংখ্যার অধিকারী এই সাপ্তাহিকটি কুড়ি বছরেরও অধিক কাল ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ইরানের বাইরে থেকে প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফারসি সংবাদপত্র হিসাবে এই পত্রিকা সেই দেশের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে : আর্থিক প্রাচুর্যের কারণে "হাবলুল মাতিন" প্রতিষ্ঠান অনেক পুস্তক প্রকাশ করে এবং "মিফতাহুজ জাফর" (জয়ের চাবিকাঠি) এবং "আজাদ" (স্বাধীন) নামে আরও দুটি ফারসি সংবাদপত্র প্রকাশনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে, ওই পত্রিকা দুটি যথাক্রমে ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উপরে উল্লিখিত সৈয়দ জালালুদ্দিন কাশানীর ভ্রাতা সৈয়দ হাসানী কাশানীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

এমনকী আজকের দিনে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও ফারসিচর্চা বিষয়ে কলকাতা তার চিরাচরিত পৃষ্ঠপোষকতার ধারা বজায় রেখে চলেছে। খুব বেশি

দিন আগের কথা নয়—এই কলকাতাই আধুনিক ভারতের আরবি-ফারসি ভাষার অগ্রণী পণ্ডিত মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মুখ্য সাহিত্য-কর্ম প্রকাশ কেন্দ্রের সম্মান লাভ করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা আজাদ কলেজ এবং লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ প্রভৃতি স্থানীয় উচ্চশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ব্যবস্থা করে চলেছে। কলকাতার ইরান সোসাইটি "ইন্দো-ইরানিকা" নামক তার ত্রৈমাসিক মুখপত্র এবং অন্যান্য প্রকাশনার মাধ্যমে বিগত চল্লিশ বছর ধরে ফারসি চর্চার উন্নয়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বলা চলে, ফারসি চর্চার জন্য কলকাতা যে বিপুল আতিথেয়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে এসেছে, তা যেন হাফিজের সেই বিখ্যাত কবিতায় যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে তা পূরণ করেছে :

"শক্কর শিকান শাওয়ান্দ হামে তুতিয়ানে হিন্দ্
জিন কান্দে ফার্সীকে ব-বংগালোমি রওয়াদ"

(অর্থাৎ, আজকে পাঠাই বাংলায় যে ইরানের ইক্ষুশাখা, এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টিমাখা)।

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

সমকালীন ইতিহাসের কথাকার

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥ দলীয় হয়েও সর্বদলীয়

আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি এবং সাংবাদিকতার জগতে একটি বহুশ্রুত, জনপ্রিয় নাম গোপাল হালদার। অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত অমায়িক প্রকৃতির এই আধুনিক জ্ঞানতপস্বী সাতাশিতে পদার্পণ করেও বিদ্যাজগৎ থেকে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন নি। যখন তিনি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সদস্য আর পরে কংগ্রেসের উৎসাহী কর্মী ছিলেন, কৈশোর-যৌবনের সেই কয়েকটি বছর বাদ দিলে বাকি জীবনটা বিশেষ রাজনৈতিক দলে থেকেও তিনি যে গোষ্ঠীচেতনার দ্বারা অভিভূত না হয়ে সমগ্র বাঙালি মানসের প্রতিভূ হতে পেরেছেন, তা তাঁর এই নিরন্তর জ্ঞানচর্চা ছাড়া আরও যে একটি দুর্লভ গুণের ফল, তা হল রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ক্ষমতা। আজকের দিনে যখন দলীয় রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে সকলেই "দায়বদ্ধ" হয়ে "নিরপেক্ষ" শব্দটির নির্বাসন ঘটিয়েছে, তখন একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম গোপাল হালদার! তাই চারদিকে তাকিয়ে খুঁজে বেড়াই তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী কেউ কোথাও আছেন কিনা।

॥ ২ ॥ দলিল বা ডকুমেনটারি উপন্যাস

গোপাল হালদারের প্রাবন্ধিক খ্যাতি তাঁর কথাশিল্পী-সত্তাকে অনেকটা আড়াল করে ফেলেছে। তিনি নিজেও হয়তো কথাশিল্পী-রূপে আত্মপরিচয় দিতে ততটা উৎসাহী নন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় যা বলা হয়েছে তার সারকথা হল এই যে, গ্রন্থগুলিকে সামাজিক উপন্যাস না ভেবে সমকালীন ইতিহাসের কথাচিত্র-রূপেই গণ্য করা উচিত। "পঞ্চাশের পথ" (১৯৪৪) সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'বইটি হচ্ছে এক ধরনের দলিল বা ডকুমেনটারি উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলা যেতে পারে।' "মন্বন্তর" সিরিজের তিনটি পর্ব সম্পর্কেই তাঁর বক্তব্য : 'এই তিন পর্বে আমি চেষ্টা করেছি ডকুমেনটারি উপন্যাসের ধরনে উপন্যাস লিখতে।...আমি একে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে উপস্থিত করেছি।' (তৃতীয় পর্ব "তেরশ পঞ্চাশ", ১৯৪৫)। লেখকের বড়ো দাবি হল—অযথার্থ ঘটনাকে তিনি কোথাও প্রশ্রয় দেন নি, ইতিহাসের সত্যকে তিনি কোথাও বিকৃত করেন নি। (দ্বিতীয় পর্ব, "উনপঞ্চাশী", ১৯৪৬)।

পর্যবেক্ষণ আর কল্পনা—লেখকসত্তার এই দুই শক্তির মধ্যে গোপাল হালদারের রচনায়—সর্বত্র না হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে—প্রথম শক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাতে তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের কোনো অমর্যাদা ঘটেছে বলে মনে হয় না। কারণ সাহিত্যসৃষ্টির কোথাও-কোথাও শিল্পগুণে যেমন বিষয়-বস্তু স্মরণীয় হয়ে ওঠে, অন্যত্র আবার বিষয়গৌরবও

সদ্যঃপ্রয়াত অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই লেখাটি আমাদের দপ্তরে প্রকাশের অপেক্ষায় জমা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ছাপা অবস্থায় লেখাটি তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

তেমনি আর্টকে মহিমান্বিত করে তোলে। গোপাল হালদার সম্পর্কে সাধারণভাবে—আবার বলছি, সাধারণভাবে, সর্বত্র নয়—দ্বিতীয় কথাটিই প্রযোজ্য।

সমকালীন ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে আজকের দিনে খুব স্বাভাবিকভাবে রাজনীতিই প্রধান হয়ে ওঠে। গোপালবাবুর উপন্যাসেও তাই হয়েছে। তাতে তাঁর উপন্যাসগুলিকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা ঠিক কিনা, আমরা সে বিতর্কে যেতে চাই না। লেখক জেনেবুঝেই প্রাধান্য দিয়েছেন রাজনৈতিক অবস্থা আর আলোচনাকে। এ প্রসঙ্গে "আনন্দমঠ", "গোরা", "পথের দাবী", "জাগরী" প্রভৃতি নাম মনে আসতে পারে। গোপালবাবু কিন্তু এগুলির কথা ভাবেন নি, ভেবেছেন বিদেশী লেখক মালরো আর স্টাইনবেকের কথা, যাদের আদর্শে বাঙালি লেখক নতুন পরীক্ষার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার সার্থকতা? লেখকের আশা, পশ্চিমে যখন সার্থক হয়েছে, আমাদের দেশেও সার্থক না হবার কারণ নেই। তাঁর নিজের রচনা ব্যর্থ হলেও শক্তিমান লেখক অবশ্যই প্রস্তুত হচ্ছেন, আর এদেশের পাঠকও তাই প্রস্তুত হয়ে উঠবেন।

চার দশকেরও বেশি হল গোপালবাবু যে আশা প্রকাশ করেছিলেন, তা কতদূর সফল হয়েছে আধুনিক পাঠকই তার বড়ো সাক্ষী।

॥ ৩ ॥ বৈষ্ণবী বিনয়

কথাশিল্পী-রূপে গোপাল হালদারের প্রথম আত্মপ্রকাশ বোধ করি ১৯২২ সালে, কুড়ি বছর বয়সে। "নদীর মায়া", "কালের কোপ" ও "জয়ন্ত" গল্প তিনটি ওই একই বছরে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। ১৯২৫-২৬ সালে "প্রথম চাকরী" ও "কাপড়ের পুঁটুলী"। পরের বছর "পারুল"। দেখা যাচ্ছে, সক্রিয় রাজনীতি নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও গল্পরচনায় তাঁর আগ্রহ আর মুনশিয়ানার কিছু অভাব ছিল না। কিন্তু কেন জানি না, কথাশিল্পের এই পথ থেকে ধীরে-ধীরে বিদায় নিয়ে তিনি প্রবন্ধরচনার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। পূর্বোল্লিখিত ছয়টির সঙ্গে আরও চারটি গল্প যোগ করে দীর্ঘকাল পরে, ১৯৪৮ সালে, প্রকাশ করেন 'গল্পসংকলন "ধূলিকণা"। লেখকের ভূমিকা থেকে—'এক কালে যে আমি গল্প লিখতাম সে কথা আমিই ভুলে গিয়েছিলাম।' তা ভুলে যান, আমাদের কাছে কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় সংকলনের নামটি—"ধূলিকণা"। লেখকের ভাষায়—'পিছনকার পথের এই ধূলিকণা হয়তো ঝেড়ে ফেলবার মতোই, সঞ্চয় করবার মতো নয়।' গোপাল হালদার অসাধারণ বলেই অমন একটি লাইন লিখতে পেরেছেন।

॥ ৪ ॥ উপন্যাসের পথ

লেখক যতই বিনয় প্রকাশ করুন না কেন, গল্পলেখার কৌশল তাঁর অনায়ত্ত ছিল না। তবু যে তিনি গল্প ছেড়ে উপন্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়েন, তার প্রধান কারণ লেখকের গভীর না হোক ব্যাপক জীবনদর্শন প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল ছোটো গল্পের সংকীর্ণ গণ্ডির বদলে উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমি।

ঔপন্যাসিকরূপে গোপাল হালদারের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৩৯ সালে—"একদা" উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। "একদা" প্রকাশের সমকালীন সমাজ আর সাহিত্যের কথা মনে পড়ে। বর্তমান শতকের চল্লিশের দশক বাঙালির জীবনে নিদারুণ বিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত। মাত্র দশটি বছরের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের অগস্ট আন্দোলন, বন্যার ধ্বংসলীলা, জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় বাঙালি-অবাঙালি-নির্বিশেষে কলকাতা ত্যাগের হিড়িক, নিষ্প্রদীপ মহানগরী, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, নারকীয় গণহত্যা, দেশবিভাগ এবং তার আনুষঙ্গিক পরিণাম। এবং এই সবকিছুর সূচনা বলা যেতে পারে ১৯৩৯-এর সেপটেমবরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ থেকে। "একদা" বইটির সঙ্গে এযুগের ঘটনাগত কোনো সংযোগ অবশ্য নেই। প্রায় এক দশক আগে ১৩৩৭ (১৯৩০) সালের আশ্বিনের একটি দিনে

জেল-ফেরত নায়ক অমিতের চিন্তাপ্রবাহই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

গোপাল হালদারের উপন্যাসগুলির ঘটনাকাল যাই হোক সবগুলির প্রকাশ হয়েছে ১৯৩৯-৫৩—এই ১৪-১৫ বছরের মধ্যে। এই যুগটি জাতীয় দুর্যোগের কাল হলেও বাঙালি লেখকদের লেখনী স্তব্ধ হয়ে ছিল না, বরং বলা যায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। গল্প-উপন্যাস তাদের শীর্ষস্থানীয়। অর্থাৎ গোপাল হালদার বাঙলা কথাসাহিত্যের কোনো বন্ধ্যাযুগে এসেছিলেন বলা চলে না। তাঁর অগ্রবর্তী এক দশকে যেমন পাই "পথের পাঁচালী" (১৯২৯) থেকে "যার যেথা দেশ", "তৃণখণ্ড", "দৃষ্টিপ্রদীপ", "পুতুলনাচের ইতিকথা", "পদ্মানদীর মাঝি", "দ্বৈরথ", "আরণ্যক" প্রভৃতি তাঁর সমকালীন এক দশকে পাই আরও বেশি গ্রন্থ ও গ্রন্থকার। গ্রন্থকারদের নামের প্রয়োজন নেই, কালানুক্রমিকভাবে মাত্র কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাচ্ছে: "ধাত্রীদেবতা", "পদ্মা প্রমত্তা নদী" (১৯৩৯); "কালিন্দী", "শহরতলী", "মৃগয়া", "নির্মোক", "আদর্শ হিন্দু হোটেল" ('৪০); "গণদেবতা", "নীলাঙ্গুরীয়", ('৪২); "পঞ্চগ্রাম", "জঙ্গম", "তিলাঞ্জলি", "ভুলি নাই" ('৪৩); "মন্বন্তর", "মরামাটি", "উপনিবেশ" ('৪৪); "জাগরী" ('৪৫); "সূর্যসারথি", "কালো ঘোড়া" ('৪৬); "দ্বীপপুঞ্জ", "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" ('৪৭); "অহিংসা", "বাঁশের কেল্লা" ('৪৮); "ইছামতী", "তিথিডোর" ('৪৯)। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়—গোপাল হালদারের উপন্যাসগুলি রচনার কালে বাঙলা সাহিত্যের বেশ কয়েকজন প্রথম সারির কথাশিল্পীও উপন্যাসরচনায় ব্যাপৃত। সমকালীন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁরা অনেক কথা বললেও গোপালবাবুরও নিজস্ব কিছু বক্তব্য ছিল যা প্রকাশের জন্য তিনি উপন্যাসের পথ বেছে নিলেন, যদিও উপন্যাসরচনা তাঁর forte নয়।

॥ ৫ ॥ উপন্যাসের রূপ ও বক্তব্য : শ্রেণীবিভাগ

সাধারণত দেখা যায়, প্রচলিত উপন্যাসকার কাহিনী গ্রন্থনের জন্য বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন প্লট আর পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। শ্রীহালদারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তাঁর ডজন খানেক উপন্যাসের মূল শিক্ষা একই—যেখান থেকে কাহিনী-মহীরুহ নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে। লেখকের প্রধান লক্ষ্য—বাঙালি ভদ্রলোকের, ঠিক-ঠিক বলতে গেলে মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণীর, উদ্‌ভব-সমৃদ্ধি-অবক্ষয়ের ইতিবৃত্তটি সবিস্তারে তুলে ধরা। বিষয়টি বাঙলা সাহিত্যে আনকোরা নতুন কিছু নয়, কিন্তু তার ব্যাপক আর বিস্তৃত রূপ অবশ্যই নতুন।

এ সম্পর্কে "ভাঙন" (১৯৪৭) উপন্যাসের নিবেদনে লেখক যা বলেছেন, তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১৯৩৭ সালে লেখক যখন রাজবন্দী তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, রাজনীতিরও মূল কথা সমাজ-জীবন। এবং এই সত্যটি বুঝতে পেরে তখনই তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল যে বাঙলাদেশের মধ্যবিত্তের প্রকাশ আর পরিণতির তত্ত্বটিকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন। ১৯৩৪-৩৫-এ লেখকদের চোখে অন্তত মনে হয়েছিল যে, ১৯২০-৩০ সালের মধ্যেই বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনের বনিয়াদে ভাঙন প্রায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর দিন আর ফিরে আসবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ের ঝাপটায় বাঙালির সেই ভাঙন-ধরা জীবনযাত্রা চুরমার হয়ে গেল। শুধু মন্বন্তর-মহামারী নয়, চোরা-কারবার আর মুনাফা শিকারের মধ্যে বাঙালি ভদ্রশ্রেণীর জীবন ও আদর্শ যে তলিয়ে গিয়েছে, একথা ১৯৪৭-এ (অর্থাৎ "ভাঙন" উপন্যাস প্রকাশকালে) বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না।

এই তত্ত্বটির পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক রূপদানের জন্যই লেখকের উপন্যাসরচনার প্রয়াস। টেইল (tale) নয়, সাগা (saga)। পদ্মাতীরবর্তী এক গ্রামের চৌধুরী পরিবারের কাহিনী, আর সেই কাহিনীর কালসীমা

প্রসারিত অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। প্রায় সাড়ে তিন শ বছর ব্যাপী পরিকল্পিত কাহিনীকে লেখক মোট চারটি বিভাগ বা সিরিজে ভাগ করে নিয়েছেন। ট্রিলজি বা তিন-তিনখানি উপন্যাস নিয়ে এক-একটি সিরিজ। অর্থাৎ মোট বারোখানি উপন্যাস। কিন্তু প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা এগারো। কারণ প্রথম সিরিজের তৃতীয় উপন্যাসখানি আজও অপ্রকাশিত। সিরিজের নাম, উপন্যাসের নাম, প্রতিটি উপন্যাসের ঘটনাকাল ও প্রকাশকাল সাজিয়ে দেওয়া হল। পাঠক লক্ষ করবেন, লেখকের পরিকল্পনা যাই হোক, গ্রন্থের ঘটনাকাল ও প্রকাশকাল সর্বদা পারম্পর্য রক্ষা করে চলে নি। এর প্রধান কারণ মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে (পরাধীন ও স্বাধীন দুই ভাঙতেই) লেখকের দীর্ঘ কারাবাস।

সিরিজের নাম	উপন্যাসের নাম	ঘটনাকাল	প্রকাশকাল
ভদ্রাসন	১. ভূমিকা	১৬০৯-১৮৫০	১৯৫২
	২. নবগঙ্গা	১৮৫৮-৭০	১৯৫৩
	৩. এ যৌবন জলতরঙ্গ	১৮৭০-১৯০৫	অপ্রকাশিত
শতাব্দীর স্রোত	৪. ভাঙন	১৯১০-২৪	১৯৪৭
	৫. স্রোতের দীপ	১৯২৪-২৭	১৯৫০
	৬. উজানগঙ্গা	১৯২৭-৩০	১৯৫০
মন্বন্তর	৭. পঞ্চাশের পথ	১৯৪২ (এপ্রিল-অগস্ট)	১৯৪৪
	৮. উনপঞ্চাশী	১৯৪২ (অগস্ট-ডিসেম্বর)	১৯৪৬
	৯. তের'শ পঞ্চাশ	১৯৪৩ (জানুয়ারি-৪৪ এপ্রিল)	১৯৪৫
একদা	১০. একদা	১৯৩০ (অগ্রহায়ণের একটি দিন)	১৯৩৯
	১১. অন্যদিন	১৯৩৭ (আশ্বিনের একটি দিন) [১২৫০]	

১২. আর একদিন ১৯৪৮ (চৈত্রের একটি দিন) [১২৫১]

॥ ৬ ॥ ভৌমিকের দিন অস্তমিত

ভদ্রাসন সিরিজে ভদ্রশ্রেণীর উদ্‌ভব। প্রথম উপন্যাস "ভূমিকা"য় বলা হয়েছে, তাঁদের সেই কালের কথা যখন তাঁরা ছিলেন ভৌমিক অর্থাৎ ভূমিনির্ভর বা ভূম্যধিকারী। চিত্রিসারে চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর চৌধুরীকে দিয়ে সূচনা। সৌম্য সুদীর্ঘ সমুন্নত-দেহ ব্রাহ্মণ। তখন থেকেই দেশের আনাচে-কানাচে পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির পদসঞ্চার। চৌধুরী পরিবারের সপ্তম পুরুষ পদ্মনাভ নিজের জীবনেই দেখেছে আলীবর্দী খাঁর ভাগ্যোদয়। পদ্মনাভের গৃহজীবনেও কিছুটা মুসলমানি দস্তুর, অবশ্য বসতবাটীর অন্তঃপুরে নয়, বহির্বাটীতে। কিন্তু পদ্মনাভ বুঝতে পারল নব-জাগ্রত শক্তি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। পদ্মনাভ তাই কোম্পানির আশ্রিত জমিদার। কিন্তু কোম্পানির দিনও শেষ হয়ে আসছে। ভৌমিক-মহিমার দিনও আর ফিরে আসবে না। বানিয়া-দালালের যুগ এসে গেছে। নতুন যুগে ভাগ্যলাভ করতে হলে চাই ইংরেজদের সঙ্গে যোগ। চৌধুরীরা বুঝতে পারল—অর্থোপার্জনের কোনো নতুন উপায় না দেখলে—মানসম্মান দূরে থাক, পরিবারের ব্যয়-সঙ্কুলানও সম্ভব নয়। ভৌমিকের ভূমিকা শেষ হচ্ছে; এখন চাই উদ্যোগ, উদ্যম, পৌরুষ।

॥ ৭ ॥ বাঙালির জীবনে নবগঙ্গা

অর্থোপার্জনের জন্য উদ্যোগ, উদ্যম, পৌরুষ জরুরি তো বটেই। কিন্তু ভাবের ঘর শূন্য রেখে নয়। অথচ ভাবের নবগঙ্গা কলকাতায় প্রবাহিত, প্রবাহিত পশ্চিমবঙ্গের কিছু-কিছু অঞ্চলে। পূর্ববঙ্গ তো পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। হুগলী-শ্রীরামপুরের বনমালী চট্টোপাধ্যায়কে সরকারি চাকুরি নিয়ে আসতে হল কিনা এমন দেশে। ইস্কুলের ডেপুটি ইনসপেকটর বনমালীর দুঃখ এই পূর্ববঙ্গে নির্বাসনের জন্য। কিন্তু চৌধুরী পরিবারের দেবপ্রসাদকে পেয়ে বনমালীর দুঃখ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। তাঁদের মধ্যে মনের সুখে সাহিত্য আলোচনা চলে, সদ্যঃপ্রকাশিত "কপাল-কুণ্ডলা"ও সে আলোচনা থেকে বাদ যায় না। পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে বনমালীর বিরূপ ধারণা দূর হয়। ভাবের এই নবগঙ্গা একালে বুঝি সকল খাতেই বয়ে যাবে—স হ স্রধারায় পূর্বে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে। নতুন সভ্যতার জয়ধ্বনি দিকে-দিকে।

উপরে যে দুটি উপন্যাসের কথা বলা হল তাতে সামাজিক বক্তব্যের গুরুত্ব যতটা প্রকাশ পেয়েছে, ঔপন্যাসিক রস ততটা সঞ্চারিত হয় নি। প্রধান কারণ আমাদের মনে হয়—এ যুগের কথা লেখকের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে লেখকের উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ ঘটেছে বলে তাদের আকর্ষণ স্বভাবতই অনেক বেশি। গোপালবাবু নিজেও এ-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে প্রথম দুখানি উপন্যাস প্রকাশ করলেন সকলের শেষে এবং তৃতীয় উপন্যাস-খানি অপ্রকাশিতই থেকে গেল।

॥ ৮ ॥ বাঙালি ভদ্রশ্রেণীর সংকট : ১৯২০-৩০

প্রথম সিরিজ "ভদ্রাসন", অসম্পূর্ণ ও বর্ণহীন। এই সিরিজের যা কিছু মূল্য পরবর্তী সিরিজগুলির, বিশেষ করে দ্বিতীয় সিরিজ "শতাব্দীর স্রোত"-এর পটভূমিকা রূপে। "ভাঙন", "স্রোতের দীপ" ও "উজানগঙ্গা" সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য: 'প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাঙালি ভদ্রলোকের জীবনের সংকটমুখী এই কালটির একটি চিত্র এইসব গ্রন্থে আমি আঁকবার চেষ্টা করেছি।' লেখক যে সংকটের কথা বলেছেন, সেই সংকটে বিপর্যস্ত ব্যক্তি আর কেউ নন, চিত্রিসারের চৌধুরী পরিবারের দশম পুরুষ পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সী জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী, যিনি মেঘনা-তীরবর্তী মধুখালি শহরের একজন নামজাদা উকিল। বাস্তুত সচ্ছল সম্পন্ন জীবনের অধিকারী হলেও ১৯২০ সাল নাগাদ তাঁর জীবন ঘিরে ভিতরে আর বাইরে যে দুর্যোগের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে তার থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথ নেই।

বাইরের বিপদের আভাস দেওয়া হয়েছে "ভাঙন"-এর গোড়াতেই। চিত্রিসারে চৌধুরীদের ভদ্রাসন এবং মধুখালির জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর বাড়ি—দুই-ই ছিল যথাক্রমে পদ্মা আর মেঘনা নদীর নিকটে থেকেও নিরাপদ দূরত্বে। দশ বছরের মধ্যে সেই নিরাপত্তা মরীচিকা হয়ে গেল। মধুখালির বাসভবন আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। "উজানগঙ্গা"-র শেষে দেখি, চিত্রিসারে ভদ্রাসন জ্ঞান চৌধুরীর চোখের সামনে পদ্মার স্রোতে মিলিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে বিগ্রহশুদ্ধ নীলমাধবের মন্দির নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই দুটি বাড়িই ছিল জ্ঞানশঙ্করের প্রধান সঞ্চয়, চরম ভরসা। আজ তাঁর গৃহ নেই, অর্থ নেই, আশ্রয় নেই।

ব্যাপারটা শোকাবহ হলেও জ্ঞান চৌধুরীর চরম আঘাত এসেছে পারিবারিক জীবন থেকে। মৃত্যু-জনিত দু-একটি আঘাত অবশ্যই তাঁকে পেতে হয়েছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রিয় বন্ধু রেবতীর আকস্মিক মৃত্যুতে জ্ঞানশঙ্কর অকস্মাৎ মৃত্যু-সচেতন হয়ে উঠলেন —Verily in the midst of life we are in death, we are in death. দ্বিতীয় মৃত্যু জ্ঞান চৌধুরীর বড়ো মেয়ে সরযূর। স্বামী নৃপেনের চরিত্রহীনতায় মর্মপীড়িত সরযূ বিষপানে আত্মঘাতিনী হয়। এই মৃত্যু দুটি জ্ঞানশঙ্করকে নিশ্চয়ই বিচলিত করেছিল।

কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি বিচলিত হন, সমাজ-জীবনে এবং নিজের পরিবারের মধ্যেও ভদ্র জীবনাদর্শের আর জীবনশ্রীর শোচনীয় অধঃপতন দেখে। সকলেই পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার ভুলে যাচ্ছে। এযুগে সবই অস্থির, সবই অপ্রকৃতিস্থ, সবাই এখন স্বজন-সংসার সম্বন্ধে অল্পাধিক আগ্রহহীন, দায়িত্ববিহীন। জ্ঞানশঙ্করের পরবর্তী প্রজন্মের কেউ আর চিত্রিসারের চৌধুরী পরিবারের ভদ্রাসন নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ভ্রাতুষ্পুত্র অমর এম. এ. পাশ করে চলে গেল পানজাবের একটা কলেজের অধ্যাপক হয়ে। চিত্রিসারের চৌধুরী পরিবার নিয়ে থাকলে তার চলবে না। সে বিয়ে করতে চায় একটি অবাঙালি মেয়েকে। তার বাবা ছিলেন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কোঁকনী ব্রাহ্মণ, মা মালাবারের সিরিয়ান খ্রীষ্টান। অমরের চোখে চৌধুরী বংশের ঐতিহ্য মূল্যহীন। তার বক্তব্য : 'কোথায় কবেকার চৌধুরী, কিই বা তাদের কাজ? আর কিই বা তার মূল্য আজকের এই নতুন যুগে? ইউরোপের মানুষ রিনেইসেন্সের বার্তা নিয়ে দেশ-বিদেশে ছুটেছে, আর কর্তারা মনসাতলায় বসে শুনছেন ভাসানগান। নিতান্ত গ্রাম্য মানুষের সভ্যতা আর কী। দেশ চলে গেল ইংরেজদের পায়ের তলায় আর এদেশে রচিত হচ্ছে ভগবতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যগান।' অমরের এসব কথায় জ্ঞান দুঃখ পায়।

আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেশ্বর ব্যবসায়ে উন্নতি করেছে, হাতে তার নতুন ঐশ্বর্য, ব্যবসায়ে সে আরও টাকা রোজগার করতে চায়। তার ছোটো ভাই নতুন চাকরি পেয়ে চলল শ্বশুরবাড়ি। সুরেশ্বর-অতুল দুজনেই চিত্রিসারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে।

জ্ঞানশঙ্করের বড়ো ছেলে অশোক কলকাতায় বি.এ. পড়তে গিয়ে গান্ধীর নন-কোঅপারেশন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ সরকারের রাজবন্দী। মুক্তির পরে অশোকের পরিবর্তন। এক সময়ে সে ছিল, লেখকের মতোই, বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সদস্য, সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু তখন সে চায় গণ-বিপ্লব—চায় মাস রিভোল্যুশন। এখন আর সে গান্ধীবাদ মানে না, এখন সে বলশেভিক—এই সমাজ, এই সভ্যতা, এই আদর্শ কোনোটাই সে মানে না। অশোক কিন্তু পিতার পার্শ্বে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু দাঁড়াল না, দাঁড়াবেও না।

জ্ঞানশঙ্করের ছোটো ছেলে অরুণ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে। জ্ঞানশঙ্কর মর্মাহত। অরুণ তার বন্ধুর বিবাহিতা বোনের কাছে প্রেমপত্র লেখে। অরুণের বয়স তখন আঠারো। পড়াশুনো তার ভালো লাগে না, ভালো লাগে খেলাধুলো গান-বাজনা—এইসব। জ্ঞানশঙ্করের ছেলে শেষ পর্যন্ত হবে পেশাদার অভিনেতা! সিনেমার অ্যাক্টর! অশোক আবার অরুণের সমর্থক, কারণ লেনিন বলেছেন ফিলম ভবিষ্যতের শিল্প!

জ্ঞান চৌধুরীর আদরের মেয়ে অমিতা। সে বিয়ে করতে চায় কালচিতা গ্রামের সেনেদের বাড়ির কোনো ছেলেকে। বৈদ্য আর ব্রাহ্মণের কথা নয় শুধু, জাতি-গোত্রের কথা নয় মাত্র, চৌধুরী আর সেনেদের কথা—বহুদিনের কুলমানগত অপমানের কথা, দ্বন্দ্ব-বিরোধ রক্তপাতের কথাও! অমিতাও এই বিদ্রোহের আবর্তে গা ভাসিয়ে দিয়েছে? এ কি তার উন্মাদনা? পিতৃ-কুলের মানমর্যাদা, ভারতীয় নারীজীবনের সংযম-শালীনতা সব ভুলতে বসেছে? প্রবৃত্তিতাড়িত উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কি অমিতাকেও পেয়ে বসেছে? জ্ঞানশঙ্কর আর সহ্য করতে পারছেন না, তাঁর মনে হচ্ছে—I am bound upon a wheel of fire.

এই দুঃসহ দুদিনে জ্ঞান চৌধুরীর মনে পড়ে গীতার কথা, মনে পড়ে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। তখন তাঁর স্বগতোক্তি : পুরোনো পৃথিবী কত শত সাম্রাজ্যের মহিমাকে ধূলিসাৎ করে নতুন সাহসে নতুন জীবন রচনায় অগ্রসর হয়ে চলেছে। আর তুমি জ্ঞান চৌধুরী, তুমি চাও—মহাকাল শুধু তোমার এই ষাট বছরের জীবনের-পাতাটিকেই চিরকাল আবৃত্তি করবে তোমার এই ভদ্রাসনে বসে।

নিদারুণ ব্যর্থতায় ও মহৎ সান্ত্বনায় জ্ঞান চৌধুরীর মতো বিরল ট্র্যাজিক চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

॥ ৯ ॥ All roads lead to Communism

"শতাব্দীর স্রোত" সিরিজে আগাগোড়া প্রধান চরিত্রে জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী। তার বড়ো ছেলে অশোকের রাজনৈতিক রূপান্তর ওই সিরিজের প্রথম বই "ভাঙন"

উপন্যাসেই লক্ষ করা যায়। "ভাঙন"-এর ঘটনাকাল ১৯২০-২৪। কলকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯২০) অশোক কংগ্রেস নিয়ে মত্ত। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পরেই দেখি 'অশোক এখন আর গান্ধীবাদ মানে না।' এক সময়ে অশোক চরকা আর খদ্দর নিয়ে মত্ত ছিল, এখন সে পথ পরিত্যাগ করেছে। অশোকের এই রাজনৈতিক "ধর্মান্তরীকরণ"-এর স্তরগুলি স্পষ্ট নয়। শুধু জানা যায়, হীরেন্দ্র চক্রবর্তী সমাজতন্ত্রের মন্ত্র আউড়ে বিদেশে ছুটল, আর অশোকের নামে আসতে থাকে বিদেশের কাগজ ও বইপত্র। অশোক হয়ে গেল সমাজতন্ত্রী। এই বিবরণটুকু পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট তৃপ্তিকর বলে মনে নাও হতে পারে। বিশেষ করে সেই অশোকের বেলায় যে কৈশোরের প্রথম সোপানে স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের বই আলমারি থেকে চুরি করে নিয়ে পড়েছে, ভগিনী নিবেদিতার লেখা ও অরবিন্দের ভারতীয় আদর্শের প্রেরণায় যে মানুষ হয়েছে, ভারতের সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরূপকে মেলাতে না পারলে যে তৃপ্তি পেত না। সেই অশোককে যখন দেখি জাতীয় আদর্শের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করতে তখন স্বভাবতই পাঠকের প্রত্যাশা জাগে তার মানসিক প্রস্তুতি আর দ্বন্দ্বের কথা শোনবার। লেখক পাঠকের এ প্রত্যাশা পূরণ করেন নি। অশোক যদি শুধু লালঝাণ্ডাধারী ও চোঙায় ফুৎকারকারী মার্কসবাদী হত, তাহলে পাঠকের কোনো প্রত্যাশাই থাকত না।

'স্রোতের দীপ' (ঘটনাকাল ১৯২৪-২৭) উপন্যাসে মার্কসবাদী অশোক অনেকটা অগ্রসর। জ্ঞান চৌধুরী বারাহীপুরের প্রজাপীড়ক জমিদারের উকিল আর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোক বারাহীপুরের উৎপীড়িত ভয়াতুর প্রজার মুখপাত্র। আজকের দিনে সিনেমার কল্যাণে পিতাপুত্রের এই-জাতীয় সংঘর্ষের ব্যাপারটা খুবই সহজ ও সস্তা হয়ে এসেছে। কিন্তু আলোচ্য কাহিনী ষাট বছর আগেকার। এখানের মুখ্য চরিত্র অশোকের পিতা, অশোক নয়।

অশোককে মুখ্যচরিত্ররূপে পাই পরবর্তী সিরিজ "একদা"য়। তখন আর সে অশোক নয়, অমিত। তাদের নাম ভিন্ন, ব্যক্তিত্ব অভিন্ন। তফাত এই, অশোকের চেয়ে প্রথমত বয়সে, বুদ্ধিতেও অভিজ্ঞতায় অনেক বড়ো। নতুন দীক্ষাগ্রহণের অত্যুৎসাহে অশোক তার স্বভাবধর্মকেও লঙ্ঘন করে চলে। যে অশোক বরাবরই ছিল বিনয়ী ও শিষ্টাচারী, মার্জিতমনা ও শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, দীক্ষাগ্রহণের পরে সেই অশোক ফ্যানাটিক হয়ে ওঠে। বাপকে পড়তে দেয় কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, বলে কিনা এমন আগুন তারা জ্বালাবে যা গঙ্গার সমস্ত আধ্যাত্মিক জলেও আর নিভবে না। জ্ঞানশঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ করেন, অশোক-ওদের কাছে মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথও বাতিল। ওরা লাফালাফি করে নজরুল ইসলামকে নিয়ে—সাম্যের গান গাহি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে (১৯২৫) তাঁর সম্পর্কে অশোকের কটূক্তি। কী অন্ধ গোঁড়ামি অশোকের। অশোকের এই ভয়াবহ পরিণতি দেখে পিতা মর্মাহত।

অমিতকে পাই সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে। বিশিষ্ট মতবাদের অনুরাগী হলেও তার মধ্যে গোঁড়ামি নেই, উগ্রতা নেই। অশোক কেবল পুঁথিপড়া কথা কপচায়। অমিতের জ্ঞানচর্চার সঙ্গে অভিজ্ঞতাও যুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা—তার অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদন-শীল মন। ১৯৩০ সালেই দেখতে পাই—অমিতের সময়য়পন্থীর রূপ। সে চায় বিভিন্ন পন্থার বন্ধুদের একসূত্রে বাঁধতে, সেটি হল স্বাধীনতার সূত্র। কিন্তু কার্যত তা করা যাচ্ছে না। কট্টর কমিউনিস্ট মোতাহের তো অমিতকে বলে পেটিবুর্জোয়াদের দালাল। অমিত যাদের সঙ্গে কাজ করে তাদের মধ্যে 'জাতিবৈষম্য' বড়ো প্রবল। জাতিবৈষম্য মানে পার্টি-বৈষম্য। অমিতের সম্মিলিত সংগ্রামশীল দল গড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

"শতাব্দীর স্রোত" পর্যায়ের উপন্যাসগুলির প্রধান আকর্ষণ জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী। তেমনি "একদা" সিরিজের

আকর্ষণ অমিতের মতো হৃদয়বান চরিত্র। কমিউনিস্ট হয়েও সে অসহিষ্ণু নয়, পূর্ব প্রজন্মের জ্ঞানবৃদ্ধদের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল এবং অ-কমিউনিস্টসুলভ বেশ কয়েকটি গুণের জন্য সে সহজেই পাঠকের প্রীতিভাজন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথকে সে বুর্জোয়াকবি বলে দূরে সরিয়ে রাখে না। তাই তো সে আসানসোলে পৌঁছে রেলগাড়ি থেকে বাঙলার দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে বলে উঠতে পারে—'আশ্চর্য বাঙলাদেশ, আশ্চর্য তার শরৎকাল।' তার মনে আসে গুনগুনিয়ে 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি'। বাড়ি ফিরে আলমারির বইগুলির দিকে তাকিয়ে তার মনে হল—শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ অমিতকে পথ দেখিয়েছেন কত নিস্তব্ধ নিশীথে, কত দুঃসহ ক্লান্তির মধ্যে। 'প্রথম তোমাকে রবীন্দ্রনাথ, জীবনরসের আনন্দসায়রে তুমি অমিতকে অন্তত মুক্তি দিয়েছ।'

এহেন 'মানবিক কমিউনিস্ট' অমিত ১৯৩৭ সালে জেল থেকে ফিরে এসে শুনল, তার মুক্তি দাবি করে সেদিন কমিউনিস্ট ছাত্ররাই মিছিলের ব্যবস্থা করেছিল। ছাত্ররা এখন সবাই নাকি কমিউনিস্ট, তারা "বন্দেমারতম্" বলে না, বলে "ইনকেলাব জিন্দাবাদ"। পাঁচ বছর পরেই এল অমিতের মতো "মনুষ্যবাদী" কমিউনিস্টদের সামনে একটা কঠিন পরীক্ষা—বিয়াল্লিশের আন্দোলন। স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো সমস্যার সৃষ্টি হত না। কিন্তু রাশিয়া সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিণত হল জনযুদ্ধে এবং রুশ-ব্রিটেন-আমেরিকা মিত্রশক্তি বলে কংগ্রেস আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করবার শর্তে হাজার-হাজার কমিউনিস্ট বন্দী জেল থেকে ছাড়া পায়। এ প্রসঙ্গ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে "মন্বন্তর" সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস "উনপঞ্চাশী"তে। আপাতত আমরা দেখতে চাই অমিতের প্রতিক্রিয়া কী ছিল। "আর একদিন" (ঘটনাকাল ১৯৪৮) উপন্যাসে অমিতের মনে এল ছয় বছর আগেকার কথা। ইন্দ্রাণী বিবাহিতা হয়েও অমিতের প্রণয়িনী! অমিতও ইন্দ্রাণীর সঙ্গ কামনা করে। অথচ রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের মেলা সম্ভব নয়। এই অংশে অমিতের স্মৃতিচারণ: আজ বিয়াল্লিশের বিদ্রোহীয়ার সম্মুখে ইন্দ্রাণী আপনার বাঁধা ঘর ও বাঁধা সংসার পর্যন্ত বিপন্ন করে তোমাকে [অর্থাৎ অমিতকে] ডাক দিয়েছে মহোৎসবে। তার সঙ্গে তুমি সেই অগ্নিদীক্ষা নেবে না, অমিত?···অমিত, তুমি তো দেশকে ভালোবাসো, **ভালোবাসো দেশের স্বাধীনতা। আজ যখন তোমার দেশের জনতা বিপ্লবের মুখে, তখন তুমি থাকবে কোন্ মঞ্চোর চিন্তায় মগ্ন?** (এ কি লেখকের আত্মভর্ৎসনা?) কিন্তু ব্যর্থ সেই নিবেদন। জীবনের যে দুই পথ একদিন একপথ হয়ে গিয়েছিল, বিয়াল্লিশেই তা ছিন্নভিন্ন। ইন্দ্রাণী বলেছিল, 'তোমাকে স্বীকার করেছি আমি বরাবর, স্বীকার করব তোমার জীবনকে, কিন্তু প্রাণ গেলেও স্বীকার করব না তোমার মতবাদকে, তোমার সত্তার এই আত্মঘাতকে। তুমি মানুষ অমিত। মতবাদের চেয়ে মানুষ বড়ো। তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু মতবাদের মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না।' উত্তরে অমিত বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমার মন আছে, মত আছে। আমি মনুষ্যবাদী। আর এ যুগের মনুষ্যবাদই কমিউনিজম—সৃষ্টির কর্মযোগশাস্ত্র।' অমিত যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছে—All roads lead to Communism.

॥ ১০ ॥ গাড়ি লাইনচ্যুত

All roads lead to Communism—অমিতের এই প্রফেটসুলভ স্বগতোক্তির মধ্যে কতটা সত্যনিষ্ঠা এবং কতটা মিথ্যা আবেগ কাজ করেছিল, বলা কঠিন। উক্তিটা খুবই চমকে দেবার মতো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, লেখক হিসাবে গোপাল হালদার আদৌ চমক সৃষ্টির পক্ষপাতী নন। তাঁর লেখা চমকপ্রদ নয়, আলোকপ্রদ। কেবলমাত্র "একদা" সিরিজের উপন্যাস তিনটিতে বার-বার চমক এসেছে, এবং সেই চমকের পেছনে ক্রিয়াশীল আবেগ-বিহ্বলতা।

যুক্তিনিষ্ঠ গোপালবাবু বড়ো একটা আবেগের বশীভূত হন না। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অমিতের এক-একটি দিনের চেতনাপ্রবাহের মধ্যে কয়েক বছরের ঘটনার নির্যাস ঘনীভূত হওয়ার ভাব কখনো-কখনো ভাবালুতার পর্যায়ে নেমে গেছে। অন্যান্য সিরিজ সাধারণ উপন্যাসের মতো বর্ণনাত্মক, "একদা" সিরিজ ভাবাত্মক। এই টেকনিক বদলের ফলেই হয়তো ঘটেছে ভাবাতিরেক।

মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত। "অন্যদিন" বইটিতে 'তুমি ভারতবর্ষের আগামী দিনের মুক্ত মানুষের পুরোধা, তুমি মহামানবের আগামী নায়ক' ইত্যাকার অমিতের আত্মসম্বোধন কিশোরসুলভ বাগ্‌বিলাসমাত্র। "আর একদিন" উপন্যাস থেকে 'কলকাতার পথ, কলকাতার মানুষ—এই পৃথিবীর আশ্চর্য যুগের আশ্চর্য মানুষ—তোমরা আমাকে পরমাশ্চর্যের পাথেয় যোগাইয়াছ—তোমাদের সকলকে প্রণাম। আমি অমিত, তোমাদের সকলের উদ্দেশে এই পথ ও আকাশকে সাক্ষী করিয়া আমার অন্তরের প্রণাম রাখিতেছি।' এখানে রোমানটিক কবি এসে ঔপন্যাসিক গোপাল-বাবুর কলম কেড়ে নিয়েছে। কলকাতাকে মন্দির কল্পনা করে সেই মন্দিরের দুয়ারে প্রণাম জানাতে কমিউনিস্ট অমিতের সঙ্কোচ বোধ হয় নি। আমরা অকমিউনিস্টরা কিন্তু লজ্জাবোধ করছি। "একদা" সিরিজ প্রকাশের চার দশক পরে একদিন লেখকের মুখোমুখি বসার সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম—'সমস্ত রাজপথ তো সাম্যবাদ-মহানগরীর দিকে প্রসারিত। আপনাদের যাত্রার অগ্রগতি কতদূর?' মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—'গাড়ি লাইনচ্যুত।'

॥ ১১ ॥ অ-কমিউনিস্ট নায়কের পরিণতি

"মন্বন্তর" সিরিজে আবার নতুন পরীক্ষা—টেক্‌নিকের দিক থেকে নয়, গ্রন্থের নায়ক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে। মন্বন্তরকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নিয়ে ট্রিলজি রচনা করতে গিয়ে কমিউনিস্ট লেখকের পক্ষে একজন অ-কমিউনিস্ট ব্যক্তিকে নায়ক করার ব্যাপারটা রীতিমত দুর্বোধ্য। এ সম্পর্কে লেখকের কৈফিয়তটা শোনবার মতো: 'আমি খুঁজে নিয়েছি এমন লোককে যে শিক্ষিত বাঙলার কোন মতামতের সংস্পর্শে আসে নি—সাধারণ বাঙালি—যে পলিটিক্‌সও পছন্দ করে না, যে আত্মকেন্দ্রিক বা আবেগপ্রবণ নয়, শিক্ষিত শ্রেণীর হলেও নানা কাজে ছোটো-বড়ো অন্য শ্রেণীর সম্পর্কে আসছে—এমন মানুষের চোখে কেমন ঠেকেছিল এই মন্বন্তর? আর কী হবে এই ঘাত-প্রতিঘাতে তার নিজের পরিণতি?'

এই সিরিজের প্রধান চরিত্র বর্ষাপ্রত্যাগত অজ্ঞাত-কুলশীল ডাক্তার বিনয়কুমার মজুমদার না হয়ে অনায়াসে হতে পারত অমিত। তা যে হয় নি, তাতে সিরিজের আকর্ষণ বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে সাহিত্যিক উৎকর্ষ। কিন্তু বহুবার জেলখাটা প্রধান কমরেডকে নেপথ্যে রেখে লেখক যে একজন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালিকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেছেন তার একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও আছে। ঘাতপ্রতিঘাতের সম্ভাবনীয় পরিণতি যে "অদীক্ষিত" বিনয়কুমারের "দীক্ষাগ্রহণ" এরকম একটা ইঙ্গিত গ্রন্থের শেষাংশে বার দুই লক্ষ করা যায়।

একটি মেয়ে-স্কুলের শিক্ষিকা কমরেড সুধা গুপ্তের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেই বিনয়কুমার বলল—'আমি কিন্তু পলিটিকসে নেই মিস গুপ্তা।' সুধার চটপট জবাব—'আমি কিন্তু পলিটিকস ছাড়া অন্য কিছুতেই নেই ডকটর মজুমদার।' এমনি সব সরস সংলাপ মন্বন্তর সিরিজের গুরুগম্ভীর পরিস্থিতি হাস্য-রসে মধুময় করে তুলেছে।

সাধারণ লোকের চোখ দিয়ে কমিউনিস্টদের নিয়ে যে রঙ্গরস করা হয়েছে গোপাল হালদার ছাড়া অন্য কোনো কমিউনিস্ট লেখকের রচনায় তা প্রত্যাশা করা যায় না। দু-একটি নমুনা তুলে দেওয়া হচ্ছে:—

(১)—ভগবানের ইভোলুশন নিয়ে সুধার বিদ্রূপের উত্তরে বিনয় বলছে—'কমিউনিস্টদের ভগবান কেমন?

লেনিনরূপী থেকে এখন স্টালিনরূপী হয়েছেন ইভোলুশনে, না?'

(২) —সুহৃদ রায়কে ছাখোনি? কমিউনিস্টদের এক নেতা যে বিলাতফেরৎ ব্যারিস্টার, কলকাতার বড়লোক, নইলে ওদের নেতা হয়?

(৩) —কমিউনিস্ট শালারা আচ্ছা ফিকির বের করেছে—মেয়ে লাগিয়ে দেওয়া। আর জোটেও শালাদের। কোথা থেকে এসব মেয়ে এরা জোটায়, হীরু?

—কমিউনিস্ট পার্টি নইলে জমছে কী করে?

(৪) —ওই তোমাদের কমিউনিস্টদের অভ্যাস—বড় বড় থিওরি আওড়ানো। সহজ কথা, তার পেছনে মস্ত একটা বড় যুক্তি না দিলে তোমরা শান্তি পাও না। তোমাদের ওই দর্শন তো দেশের লোকে কেউ বুঝবে না। দেশের লোকের ভাষায় বলো তো ব্যাপারটা কী?

(৫) —এ তো বাংলা নয়, মিশনারি বাংলার মতো মার্কসিস্ট বাংলা। তোমাদের বাংলা বুঝতে হলে ইংরেজি অনুবাদ থাকা দরকার; ইংরেজি পড়তে হলে জানা দরকার বোধ হয় রুশ ভাষা।

লেখক যে ভূমিকায় বলেছেন অকমিউনিস্ট নায়ক বিনয়কুমারের সম্ভাব্য পরিণতির কথা, গ্রন্থের শেষ দিকে স্পষ্টভাবে তার আভাস দেওয়া হয়েছে: পলিটিকস কী বিনয় তা জানত না, বুঝত না, বুঝতে চাইত না। শিক্ষিত মানুষ সে, দেশকে ভালোবাসে—এই সে জানত নিজেকে। ঠিকই জানত। নিজেকে আরো তার জানতে বাকি ছিল। সাধারণ মানুষ সে, সাধারণের পথে চলতে চাইত। আজ বিনয় বুঝছে, এই সাধারণের পথই আসলে পলিটিক্‌সের পথ। মানুষ একসঙ্গে চলতে গেলেই সে চলা হয়ে ওঠে পলিটিকস—চলতে-চলতেই বিনয় বুঝল এ সত্য।—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় বলছে: সেই ডকটর বিনয় মজুমদার আর নেই। এ যেন কোনো রৌদ্রদগ্ধ, ক্ষুধিত, চির-উদ্বেজিত রাজনৈতিক কর্মী। তুমি রাজনৈতিক কর্মী। তুমি রাজনীতিক কর্মী, বিনয়? এই এক বছরের মধ্যে—১৩৫০ সালের মধ্য দিয়ে—মুনাফার কাণ্ডারীই জন্মে নি তাহলে শুধু? তোমার মতো চেতনাশূন্য কর্মীদেরও নবজন্ম হয়েছে তবে?

গ্রন্থ শেষ হয়েছে বিনয় ও অমিতের ছোট্ট একটি সংলাপ এবং লেখকের মন্তব্য দিয়ে। বিনয় যখন বলল—'দেশজোড়া এক মুনাফার মৃগয়া চলছে', তখন অমিতের উক্তি: **'বিনয়ও কমিউনিস্ট না হয়ে** ছাড়ছে না, কারণ কমিউনিস্টদের মূলকথা হল—'এই সভ্যতা আজ শুধু একটা মুনাফার মৃগয়া।' বিনয় বলল—**'আমি কমিউনিস্ট নই তবু, কারণ আমি ভালোবাসি ভারতবর্ষকে।**

লেখকের মন্তব্য: অমিতের চোখ স্বপ্নভরা বেদনা-ভরা হয়ে উঠল। আর সেই চোখ থেকে বিনয় ততক্ষণে পেয়ে গেছে তার সমস্ত সংশয়ের উজ্জ্বল উত্তর।

লেখকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের সংশয় নেই, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা থেকেই যাচ্ছে আমাদের মনে—বিনয়ের 'দীক্ষাগ্রহণ' সম্পর্কে গোপাল হালদার এত অনুচ্চভাষী কেন? বোধকরি এই কারণে যে তাঁর কমিউনিজমের গুরু রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (রূপনারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃ ২১৭)।

স্মরণে

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

সাড়ম্বর শোকপ্রকাশের মধ্যে প্রয়াত মানুষের প্রতি তাঁর জীবদ্দশায় যথাকর্তব্য পালন না করার একটা প্রচ্ছন্ন অজুহাত তৈরির প্রয়াস থাকতে পারে। এ সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে, এক-একজন যখন থাকেন তখন যেহেতু তিনি আছেন তাই তাঁর কাছে যা পাবার সম্ভাবনা আছে তার জন্য ঠিকমতো তাগিদ দেওয়া হয় না, বা তাঁর অধীত বিদ্যা প্রয়োগের যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করা হয় না। তারপর হঠাৎ যখন সে-মানুষটি চলে যান তখন হাজার আক্ষেপেও আর কিছু করার থাকে না। এ ধরনের মানুষের জন্য শোকপ্রকাশ বস্তুতপক্ষে হয়ে ওঠে আক্ষেপ বা আত্মশোচনা। আজ যাঁকে স্মরণ করতে হচ্ছে তাঁর জন্য নিছক শোকপ্রকাশে দায়িত্ব সমাপন হবে না। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য একাত্তর বছরের উপর জীবিত ছিলেন এবং জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত পড়া এবং লেখার কাজে যত্নশীল ছিলেন। বরং একথা বলাই ঠিক হবে যে, নিরাময়-অসাধ্য রোগাক্রমণের পরেই যেন লেখার কাজে তিনি অধিক সক্রিয় হয়ে উঠছিলেন। "চতুরঙ্গ"-র পাঠককুল তার কিছু-কিছু নিদর্শনও মনে করতে পারবেন। কিন্তু যেটুকু পাওয়া গেল তা, যা পাবার সম্ভাবনা ছিল তার তুলনায় এতই সামান্য সে কথা মনে করেই আজ আক্ষেপ শত গুণ হয়ে উঠছে।

বাঙলা সাহিত্যজগতে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের নাম খুব পরিচিত ছিল না, যদিও একদা বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং পরে কলকাতায় এসে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে "দল বেঁধে" প্রকাশিত হয়েছিল যৌথ উদ্‌যোগে। ১৯৪০ সালে কাব্যগ্রন্থ "জোনাকি" এবং "দুপুরের স্বপ্ন" প্রকাশের পর বিষ্ণুপদবাবু আর কবিতার রাজ্যে থাকেন নি। জীবনের অধিকাংশ কালই কেটেছে অধ্যাপনাকর্মে। শুরু করেছিলেন দমদম মতিঝিল স্কুলে, কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন কাটোয়া কলেজে, মেদিনীপুর কলেজ হয়ে যোগ দেন বঙ্গবাসী কলেজে, ১৯৬৩ সালে যোগ দেন আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, অবসর গ্রহণ করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বহু কৃতী ছাত্র পেয়েছেন জীবনে, ছাত্রকুলের কাছ থেকে বিপুল শ্রদ্ধাও অর্জন করেছেন। তথাপি শিক্ষক হিসেবে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের নাম তেমনভাবে স্মরণীয় হয়ে নেই, যেমন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন বঙ্গবাসী কলেজে তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। বরং কয়েকজন বরেণ্য শিক্ষকের ছাত্র হিসেবেই বিষ্ণুপদবাবু জীবনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যাঁর প্রবর্তনায় তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত, যিনি তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে তাঁকে মধ্যযুগীয় ভক্তিসাহিত্যপাঠে উৎসাহিত করেন, পরবর্তী কালে টি. পি. মীনাক্ষীসুন্দরমের সান্নিধ্যে তিনি তামিলচর্চার গভীরে প্রবেশ করেন। যে ক্ষেত্রে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের নাম ও কৃতি দীর্ঘকাল অপরিহার্য হয়ে থাকবে, তার পিছনে এই তিন মহিমান্বিত শিক্ষকের ভূমিকা বিষ্ণুপদবাবু সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতেন। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, যে ক্ষেত্রে বিষ্ণুপদবাবু সম্প্রতিকালে আমাদের মধ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন সেই ক্ষেত্রটির গুরুত্ব এবং

উপযোগিতা এখনও পর্যন্ত এদেশে যথার্থ স্বীকৃতি পেল না। অথচ বহুভাষিক এই দেশে একাধিক দেশীয় ভাষাজ্ঞাননির্ভর অনুবাদকর্মের প্রয়োজন যে কতখানি, তা বুঝতে বা মানতে খুব বেশি গবেষণা করতে লাগার কথা নয়। তবুও দেখতে পাই বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য যথেষ্ট পরিচিত নাম নয়, বোম্মানা বিশ্বনাথনের অকালমৃত্যুর পর কোথাও তাঁকে নিয়ে আলোচনা হয় না। এঁদের জীবদ্দশাতেও সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত অনুবাদকর্মশালায় এঁরা আমন্ত্রণ পান নি। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য কয়েকটি ভারতীয় ভাষা জানতেন বা অনুবাদকর্মে দক্ষ ছিলেন বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের এমন একনিষ্ঠ পাঠক আর আছে বলা জানা নেই। শুধু আগ্রহী পাঠকই ছিলেন না। সেইসব সাহিত্যের খবর, পটভূমিকা এবং সাহিত্যিকের বিষয় তিনি যে নিষ্ঠাভরে আমাদের জানিয়ে গেছেন, তার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংহতিতে আগ্রহী যাঁরা বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

বরিশাল জেলার এক গ্রামে ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে বিষ্ণুপদর জন্ম। ইস্কুলে এবং কলেজে কৃতী ছাত্র ছিলেন। ব্রজমোহন কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। বি. এ. পাসের দশ বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পাস করেন বাঙলায়। ১৯৪৭ সালে এম. এ. পাসের পর থেকেই নানা স্কুলে কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তের আগ্রহে দক্ষিণভারতীয় ভক্তি-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। নিজের চেষ্টায় কয়েকটি ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করেন। চাকরিসূত্রে দক্ষিণ ভারতে থাকাকালে তামিল চর্চার আরও সুবিধা হয়। দক্ষিণভারতীয় ভক্তিসাহিত্য নিয়েই গবেষণা করে পিএইচ ডি. লাভ করেন। "ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্য" নামে একটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ বইও রচনা করেছিলেন। পরে দিল্লিতে থাকার সময় উত্তরভারতীয় কয়েকটি ভাষাও আয়ত্ত করেন। বিষ্ণুপদর ভাষাচর্চা নিছক অনুবাদকর্মেই ব্যয়িত হয় নি, সেই ভাষার সূত্রে সেই ভাষার মানুষকে, তাদের সমাজকে, আচার অনুষ্ঠানকে, এমনকী তাদের লৌকিক সংস্কৃতিকে জানতে তাঁর আগ্রহ ছিল অব্যাহত। মানুষের জীবন সম্বন্ধে তাঁর এই আগ্রহ শুরু হয়েছিল কলেজ জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি আসার সময় থেকে। কাটোয়ায় থাকার সময় কমিউনিস্ট নেতা হরমোহন সিংহের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগ না থাকলেও প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তাঁর আগ্রহ কোনো দিনই নিষ্প্রভ হয় নি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণের পর কলকাতার সন্তোষপুরে বাস শুরু করার পর তিনি যেন নতুন উদ্যমে বাঙালি পাঠককে সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করার ব্রত গ্রহণ করলেন। ধীরে-ধীরে নিজেই হয়ে উঠলেন একটি প্রতিষ্ঠান, সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যের ব্যাপারে হয়ে উঠে ছলেন এক অপরিহার্য রেফারেন্স।

বিদ্যা বিনয়ী করে—আধুনিক বিদ্যাজীবিকার দিনে একথাটা প্রায় ভুলতে হচ্ছে। অগাধ বিদ্যা এবং তথ্যের অধিকারী বিষ্ণুপদবাবু যখন একটি সামান্য তথ্য যাচাই করার জন্য আসতেন তখন মাঝে-মাঝে মনে হত তাঁর বিনয়জাত সাংল্যের জন্যই বোধহয় এ সমাজে তাঁর যথার্থ স্বীকৃতি তিনি পেলেন না। শুধু বিনয়ই নয়, যথার্থ নিষ্ঠাও তাঁকে বিদ্যার যোগ্য অধিকারী করে তুলেছিল। সাহিত্য অকাদেমির জন্য শিবরাম কারন্তের কন্নড় উপন্যাস "মরালি মন্নিগে" বাঙলায় তর্জমা করতে গিয়ে তিনি যেভাবে কন্নড় সমাজব্যবস্থা বা আচার-বিচারের বিশদ খবর দিতেন তাতে তাঁকে নিছক অনুবাদক বলে মনে হত না। এমন মানুষই পারেন ভারতীয় সাহিত্যের পরিচয় জনসমক্ষে তুলে ধরতে। চতুরঙ্গ বা চতুরঙ্গ-এর অকাদেমি-পুরস্কারবিজয়ী উপন্যাস "বৈশাখ" তর্জমা করতে গিয়ে কিছুতেই খুশি হতে পারছিলেন না

প্রচলিত কন্নড় অভিধানগুলি দেখে। শুধুই খুঁজতেন কোনো গ্রামবাসী কন্নড়কে—যিনি লৌকিক শব্দগুলির যথার্থ প্রয়োগ এবং ব্যঞ্জনার হদিশ দেবেন তাঁকে। প্রায়ই আক্ষেপ করতেন—'মাটির কাছাকাছি মানুষকে না জানলে তার ভাষাকে কেমন করে আমার ভাষায় প্রকাশ করব।'

ব্যক্তিজীবনে এক মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন সদ্যোবিবাহিত কন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে। তার পরও আবার ধীরে-ধীরে আপন ব্রতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নিরাময়-অসাধ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত জেনেও স্থিতধী ছিলেন, আশা করছিলেন আরও কিছুকাল কর্মক্ষম থাকতে পারবেন। নানা নতুন-নতুন কাজে হাত দিচ্ছিলেন, পরিকল্পনা করছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্ররচনা অনুবাদের পাশে-পাশে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার বিবরণ সম্পূর্ণ করবেন আশা করছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাম্প্রতিক কালে নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে কী গল্প রচিত হচ্ছে, তার খোঁজ-খবর রাখছিলেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, পণপ্রথা, বধূহত্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় গল্প বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই অসুস্থ শরীরে জাতীয় গ্রন্থাগারে বা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচারে দৌড়ে আসতেন নানা ভাষায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ বা পত্রিকা দেখতে। এসব খবরের জন্য এরপর আমরা আর কার কাছে দৌড়ে যাব জানি না।

বাঙলা তদ্ধিত প্রত্যয় 'ই'

সম্বন্ধ, সংযোগ, শীল, ধর্ম, ব্যবসায়, আজীবিকা বোঝাতে এই প্রত্যয়টির ব্যবহার। সাধিত শব্দটি বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়।
যেমন—
কটকি, গুজরাতি, চাষি, তাতি, বিলাতি (বিলিতি, বিলেতি), পশমি, রেশমি, কেরানি, রাঁধুনি।

ভাববাচক বিশেষ্য বোঝাতেও এই 'ই' প্রত্যয়টির ব্যবহার হয়।
যেমন—
আমিরি, খানদানি, ডাকাতি, পণ্ডিতি, বড়োমানুষি, মোসাহেবি।

মতামত

১

পশ্চিমে প্রেরিত তুমি, আমি পুবের প্রহরী

"চতুরঙ্গ" পত্রিকার শেষ কয়েকটি সংখ্যায় হুমায়ুন আজাদ আর মৃণাল নাথের মধ্যে এক বিতর্ক চলছে। বিতর্কের উৎস আজাদের "ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান" বইটি। মৃণাল নাথ এই বইটি রিভিউ করার কালে আজাদ সাহেবের বিরুদ্ধে 'চন্দ্ররেণু-বৃত্তি' অর্থাৎ plagiarism-এর অভিযোগ এনেছেন। প্রত্যুত্তরে আজাদ অনেক কথা বলেছেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভাষাতত্ত্বের একজন উৎসাহী পাঠকমাত্র, আর আমার পাঠ একটা বিশেষ পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। তবু এই বিতর্কে যোগদানে প্ররোচিত হওয়ার কারণ—হুমায়ুন আজাদের বক্তব্য ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর এক বিশেষ জ্ঞানতত্ত্বকে তুলে ধরেছে। আমার আলোচ্য বিষয় সেটাই।

আজাদ তাঁর জবাবে এক জায়গায় বলেছেন: 'স্বদেশীদের কোনো-কোনো তথ্য ও তত্ত্বে আমার সন্দেহ আছে। বিদেশীদের বেলায় ওই সন্দেহ আমার বিশেষ নেই। পশ্চিম থেকে নেয়ায় অতোটা উত্তেজনার কোনো কারণ নেই।' তাঁর যুক্তির সম্প্রসার ঘটেছে এভাবে: 'বাঙলার প্রধানেরা পশ্চিম থেকে দু-হাতে নিতে কখনো দ্বিধা করেন নি, শুধু গৌণরাই আবর্তিত হয়েছেন মৌলিক মূর্খতার মধ্যে। ভাষাবিজ্ঞানকেও যদি আমরা একটি আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক বিদ্যায় পরিণত করতে চাই, তাহলে দু-হাতেই নিতে হবে। নইলে কিছু পেশাদার শিক্ষক পাবো, কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানী পাবো না।' চিন্তার দীনতা কোন্ পর্যায়ে গেলে ভাষা-আন্দোলনের দেশের একজন ভাষাতাত্ত্বিক এই কথা বলতে পারেন!

স্বদেশীদের তথ্যে আজাদ সাহেবের অনাস্থা আছে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ফাদার দ্যতিয়েন-এর সম্পাদনায় কেরীর "ইতিহাসমালা"র কথা। ফাদার কেরীকে কখনই রচয়িতার সম্মান দিতে নারাজ। কর্তৃত্ব-আনুগত্যের যে-সম্পর্ক তৎকালীন বাঙলাভাষাচর্চায় সাহেব ও তাঁদের মুন্সিদের মধ্যে ছিল, তারই সূত্রে সেই 'বঙ্গজ' রচয়িতার নাম ইতিহাসে কেউ জানে নি। ফাদার দ্যতিয়েন সেই নাম-চাপা-পড়ে-যাওয়া বঙ্গজ মুন্সিকেই প্রণাম জানিয়েছেন, কেরীকে নয়।

আজাদের এই পশ্চিম-নির্ভর মনন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; সযত্নলালিত ঔপনিবেশিক মানসিকতারই সদম্ভ (!) প্রকাশ। যাই হোক, হুমায়ুন আজাদ যখন সাহেবদের ক্রাচকে (crutch) নিজের পা বলে মনে করেন তো দেখি সাহেবদের কেউ-কেউ ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে কী বলছেন।

দেখছি যে সম্প্রতিকালে ইউরোপের অনেক বুদ্ধিজীবীই চ্যালেনজ জানিয়েছেন পশ্চিমী যুক্তিবাদকে। এই উদ্যোগের আধুনিকতম ব্যক্তিত্বের নাম মিশেল ফুকো। এই ফরাসি ভাবুক তাঁর বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপের অন্ধকারময় বিভিন্ন দিকের কথা। ফুকো বলতে চান: ইউরোপের জ্ঞানচর্চার ইতিহাস একই সঙ্গে জনসাধারণের ওপর ক্ষমতাবিস্তারের, আধিপত্যের ইতিহাস। ব্যাপারটি 'power' ও 'hegemony'র দিক থেকে দেখতে, বুঝতে হবে। ইতিহাসে-চাপা-দেওয়া দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে ফুকো আমাদের জানিয়েছেন—ইউরোপের মাটিতে কয়েদখানা, পাগলাগারদ, নানা সামাজিক বিধিনিষেধের জন্মবৃত্তান্ত আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে এসবের ভূমিকা। দেখি যে, ফুকো 'জ্ঞানতত্ত্ব' সম্পর্কেও অন্য ভাবনার যুক্তি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরি যে বিজ্ঞানী জোসেফ নীডহ্যাম প্রাচীন চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে-গবেষণা করে চলেছেন, তা তৎকালীন চীনা সমাজের ক্ষমতাবিন্যাসের নিরিখে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে যাচাই করার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায়। "এক্ষণ" পত্রিকার কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যায় (১৯৬৮) তাঁর "Science and Society in East and West" রচনাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে নীডহ্যাম ইউরোপকেন্দ্রিক চিন্তাবিদ্‌দের একহাত নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—'ইয়োরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বটি রাজনৈতিক অর্থে জাতি-বৈরিতা এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো যোগই নেই। ইয়োরোপীয় আত্মচালনাবাদীর কাছে, আমার ভয় হয়, "আমরাই একমাত্র মানুষ, জ্ঞানের জন্ম আমাদেরই সঙ্গে।" সে যাই হোক, যেহেতু জাতি-বৈরিতার (ন্যূনপক্ষে এর প্রকাশ) রূপগুলি যেমন চিন্তায় ভদ্র নয়, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতও নয়। আত্মচালনাবাদী তাত্ত্বিকেরা মহা বেকায়দায় পড়েছেন এবং আশা করা যায় তা কালে-কালে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।'

প্রাচ্যের কিছু বুদ্ধিজীবীও আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ইউরোপ-নির্ভর মননকে। এডওয়ার্ড সঈদ্ (Edward Said) বেশ ক বছর আগে "Orientalism" নামে এক বই লিখেছেন। সঈদ্ এ-বইয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে প্রাচ্যের ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছিল সাহেবদের হাতে: প্রাচ্যচর্চার ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, জ্ঞানচর্চার সূত্রে, ইউরোপীয় 'আধিপত্যের' (hegemony) বিস্তার। ইউরোপীয়-প্রাচ্যবাদের (Occidental Orientalism) সিদ্ধান্ত ছিল: প্রাচ্যের নিজেকে জানার ক্ষমতা নেই, প্রতীচ্যের দেখানো পথেই সে নিজেকে জানবে। ফলে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের (Enlightement) পথ ধরেই প্রাচ্য জেনেছিল তার গৌরব আর অবক্ষয়ের ইতিহাস। বিস্তারিত জানানোর আগে আরেকটি গবেষণা-গ্রন্থের উল্লেখ করতে চাই। উল্লেখ হিসেবেই জেনেছি; এখনও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না। বইটির নাম: "Geo-Cultural Visions of the World", সম্পাদনায় আছেন আনোয়ার আবদুল মালেক ও আনিসুজ্জামান। তবে আজাদ সাহেব পড়ে দেখতে পারেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সমাজনিরীক্ষণকেন্দ্র-আয়োজিত সভায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান-প্রদত্ত ভাষণ "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা"র মুদ্রিত (১৯৮৫) বয়ানটি।

সঈদ্ আমাদের দেখান কীভাবে "প্রাচ্যবাদ" (Orientalism) নামক তাত্ত্বিক ধারণাটি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ইউরোপ আসলে নানান ক্ষমতা-কাঠামোয় 'প্রাচ্য'—কে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল। আমাদের তিনি সতর্ক করে দেন: '...without examining Orientalism as a discourse one cannot possibly understand the enormously systematic discipline by which European culture was able to manage—and even produce—the Orient politically, sociologically, militarily, ideologically, scientifically and imaginatively during the post-Enlightenment period. Moreover, no authoritative a position did Orientalism have that I believe no one writing, thinking, or acting on the orient could do so without taking account of the limitations on thought and action imposed by Orientalism.' (সঈদ্ ১৯৭৮ : ৩)

এখন দেখা যাক, ঔপনিবেশিক ভারতে এই "প্রাচ্যবাদ" ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। বার্নার্ড কোহ্‌ন (Bernard Cohn) তাঁর "The Command of Language and the Language of Command" প্রবন্ধে

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৭৭০-৮৫, এই সময়কালে ভারতে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের মধ্যে ভারতীয় ভাষা শেখার ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়। জোন্‌স্‌, হ্যালহেড প্রমুখেরা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত বইপত্র রচনা করতে শুরু করেন। হ্যালহেড ব্রিটিশ ভারতে এমন এক ভাষার বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন যা-কিনা ভারতের অধিবাসীদের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব (power / hegemony অর্থে) জারি করতে সক্ষম।

হ্যালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকায় পাই '…one of its most important desiderata is the cultivation of a right understanding and of a general medium of intercourse between the Government and its subjects ; *between the Natives of Europe who are to rule and the Inhabitents of India who are to obey*' (বাঁকা হরফ আমার)]। আর তাই, প্রচলিত কথ্য ভাষাগুলো 'অশুদ্ধ' বলে মনে হয়েছিল তাঁর। এই কারণে, তিনি দ্বারস্থ হলেন সংস্কৃত ভাষার কাছে, সঙ্গে যুক্ত হল তাঁর ইউরোপকেন্দ্রিক মনন। কোহ্‌ন দেখেছেন: 'The Grammar which Halhed produced of the Bengal language was organized in terms of European grammatical categories, the parts of speech, elements and substantives, pronouns, verbs, words denoting attributes and relations, numerals, syntax, orthography and vernification being the title of his chapters. Halhed took pride in being the first European who related Bengali to Sanskrit' (কোহ্‌ন ১৯৮৫ ; Subaltern Studies, IV : ২৯৭)

ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষাচর্চার ইতিহাসের সঙ্গে কীভাবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-বিস্তারের স্বার্থ জড়িত ছিল, সে সম্পর্কে কোহ্‌ন আমাদের জানিয়েছেন যে সংস্কৃত ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ-শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল দুটি : '…at one and the same time there was a scholarly curiosity to unlock the mysterious and perhaps curious knowledge of the Ancients [হ্যালহেড রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন : 'a language of the most venerable and unfathomable antiquity'] and an immediate practical necessity as well, fuelled by Warren Hastings' plan of 1772 for the better governance of Bengal' (কোহ্‌ন : পূর্বোক্ত, ২৮৯)।

এসব থেকে বোঝা যায়, আটের শতকের শেষ দিক থেকে ভারতীয় কথ্য ভাষাগুলোর চর্চায় ব্রিটিশ শাসকরা কেন উৎসাহিত হয়েছিল। আর সময়ান্তরে একটা দেশ শাসনের ভাষা বা 'language of command' নির্মাণে কীভাবেই বা তারা সচেষ্ট হয়েছিল, সেই বৃত্তান্তও কোহ্‌ন আমাদের শোনান। অবশ্য হুমায়ুন আজাদ ব্যথিত এই ভেবে : 'উনিশ-শতক নেই, এ-শাস্ত্রের স্বর্ণযুগও আর নেই' (দ্র. তু-ঐ ভাষাবিজ্ঞান-এর ভূমিকা)। এ-শাস্ত্রের বলতে কোন্ শাস্ত্রের ? তুলনামূলক, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ?

বম্বের থেকে প্রকাশিত "ইকনমিক অ্যানড পলিটিক্যাল উইকলি" পত্রিকায় এ বছরের গোড়ায় (জানুয়ারি ২৮, ১৯৮৯) কৃষ্ণকুমার *'Colonial Citizen as an Educational Ideal'* শিরোনামে ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি কীভাবে ব্রিটিশ ভারতে 'ঔপনিবেশিক নাগরিক' সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য : 'At the heart of the colonial enterprise was an adult-child relationship. The coloniser took the role of the adult, and the native became the child. The adult-child relationship entailed an educational task. The colonial master saw it as his responsibility to initiate the native into new ways of acting and thinking'. (কুমার ১৯৮৯ : ৪৫)

দীর্ঘদিন হল ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে। তবু ঔপনিবেশিক মননপ্রক্রিয়া আজও আমাদের রক্তের গভীরে ক্রিয়াশীল। স্বাধীন বাঙলার ভাষাতাত্ত্বিককে এখনও উনিশ শতকীয় ভাষা-চিন্তায় মোহাচ্ছন্ন হতে দেখি। এবং বিদেশী পুঁথিতে আজাদ সাহেবের নির্লজ্জ-আস্থা মনে করিয়ে দেয়—বাঙলার এক কবিকে : 'আমরা খুঁজেছি বিলেতি বইতে আপন দেশ / বারবার তাই দেশের মানুষ ডাইনে বাঁয়ে / ঘুরিয়েছি আর হয়রান হয়ে খুঁজেছি শেষ। / আমরা খুঁজেছি হরেক বইতে আপন দেশ, / থেকে-থেকে বই হারিয়েছে, মোড়ে নিরুদ্দেশ / ভাবছি এবার ফিরব মোড়ল সে কোন গাঁয়ে ?' কবির নাম : বিষ্ণু দে, কবিতার নাম : জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়োলেটগুচ্ছ, কাব্যগ্রন্থ : নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, উৎসর্গপত্র : জন অরউইন, মার্টিন কর্কম্যান, পার্সি ও এপ্রিল মার্শাল-কে।

কর্তৃত্ব-আনুগত্যের সম্পর্ক ব্যতিরেকে বাঙলা ভাষার বিকাশে বিদেশী অবদান বিষয়টি দেখা সম্ভব নয়। প্রাপ্তমনস্ক প্রতীচ্য আর খোকা প্রাচ্য—সাহেবদের এই সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সূত্রটি মনে রাখা জরুরি। হুমায়ুন আজাদ সাহেব পশ্চিমের দিকে দু হাত বাড়িয়ে তাঁর মনন আর মনীষাকে প্রসারিত করতে চেয়ে সঙ্গে-চলার যে-ডাক দিয়েছেন, কজন ভাষাবিজ্ঞানী ও সচেতন নাগরিক সাড়া দেবেন জানি না। তবে ইতিহাসের এক অ-বিশেষজ্ঞ 'গৌণ'-পাঠক হিসেবে এই মনন ও প্রস্তাবকে ধিক্কার না-জানিয়ে পারছি না।

• শিরোনামটি শঙ্খ ঘোষের 'ভূমধ্যসাগর' কবিতার 'পশ্চিমপ্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের 'প্রহরী' লাইনটির অনুষঙ্গে ব্যবহার করেছি।

অরূপ সেন
কলকাতা-৫৪

২

"অসৎ আক্রোশ"—একটি বিতর্ক !

"চতুরঙ্গ" সেপটেমবর '৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত "অসৎ আক্রোশ" শিরোনামে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ সাহেবের প্রতিবাদ পত্রটি পড়লাম।

"চতুরঙ্গে"র জুলাই সংখ্যায় অধ্যাপক মৃণাল নাথ আজাদ সাহেবের "তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান" গ্রন্থটির সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনার ভাষা কিছুটা তীব্র ও শ্লেষাত্মক, যার ফলে গ্রন্থকার স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ফলে তিনি অধ্যাপক নাথের বাক্যগঠনে ভুল খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন—'প্রথম বাক্যটিই যুক্তিযুক্ত-ভাবে অশুদ্ধ', কিন্তু বাক্যটির যথাস্থানে একটি কমা-চিহ্ন বসিয়ে নিলেই তিনি তাঁর 'আকাঙ্ক্ষা' (expectancy) অনুযায়ী অর্থ পেতেন। বাক্যটি—'১৯৫৭ সালে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যতোটা না যুগান্তর বয়ে আনে চমস্কির বিপ্লবের ফলে, / তার চেয়েও বেশি বৈপ্লবিক বলা যেতে পারে ১৭৭৬ সালের স্যর উইলিয়ম জোনসের দৃপ্ত উচ্চারণকে।'—এভাবে পড়লে, অর্থাৎ বাক্যের মাঝখানে ('ফলে'-র পর) একটু থামলেই পাওয়া যাবে বাক্যের যথাযথ অর্থ। মনে হবে না—'যুক্তিযুক্তভাবে অশুদ্ধ' বা রইবে না 'অযৌক্তিক অস্বচ্ছতা'। তুলনার প্রাসঙ্গিকতাও হয়তো পরিষ্কার হয়ে উঠবে সহৃদয় পাঠকচিত্তে।

অতঃপর আলোচ্য সমালোচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের যে প্রথম বাক্যটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন

অধ্যাপক আজাদ সাহেব সেটাও আমাদের মতো সাধারণ অপণ্ডিত পাঠকের কাছে কিন্তু ক্রটিহীন বলেই মনে হয়েছে। অধ্যাপক নাথ বলেছেন, 'আলোচ্য বইটি সম্পর্কে তাঁর দাবি হয়তো কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য, সর্বাংশে তো নয়ই।'—আজাদ সাহেবে মতে—'বাক্যটির প্রথমাংশে যে সামান্য হ্যাঁ-সূচকতা আছে, তার ফলে দ্বিতীয়াংশে না-সূচকতা থাকতে পারে না।' পরিবর্তে শুদ্ধ রূপটিও দিয়েছেন তিনি। বলেছেন—'তাঁর দাবি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সত্য নয় সর্বাংশে তো নয়ই।' যার কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সত্য নয়—তার সর্বাংশের উল্লেখ বাহুল্য নয়কি? পাঠক হিসাবে আমাদের মনে হয়েছে—অধ্যাপক নাথ তাঁর (আজাদ সাহেবের) দাবির আংশিক সত্যতা স্বীকার করেছেন। কোনো যুক্তিতেই অংশ সমগ্রের সমান হতে পারে না। আজাদ সাহেব সম্ভবত উত্তেজিত মস্তিষ্কে পত্রটি লিখেছিলেন, অন্যথায় তিনি নিজেই বুঝতেন অধ্যাপক নাথের বাক্য এবং তাঁর সংশোধিত বাক্য সম-অর্থ-বোধক নয়। আমাদের কাছে অধ্যাপক নাথের বাক্যবিন্যাসে 'অর্থসঙ্গতি' (agreements of words) বা 'যোগ্যতা'র (propriety) কোনো অভাব অনুভূত হয় নি। আশা করি পরবর্তী কালে অধ্যাপক আজাদের কাছেও হবে না।

কিন্তু এহ বাহ্য। আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক যে কুম্ভীলকবৃত্তির অভিযোগ এনেছেন, তার কিন্তু কোনো সদুত্তর পেলাম না "অসৎ আক্রোশ" শীর্ষক পত্রটিতে। সমালোচক A. Arlotto-র "Introduction to Historical Linguistics" গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আজাদ সাহেবের গ্রন্থ থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ধার করে উভয়ের আক্ষরিক মিল দেখিয়ে তাঁর অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। একথাও আমাদের মনে হয় নি যে 'মৃণালবাবু সম্ভবত ইংরেজিতে একটু কাঁচা' (আজাদ সাহেব উবাচ)।

এ ছাড়াও জ্যাকবসেন (B. Jacobsen) প্রভৃতির লেখা থেকেও বিভিন্নভাবে গ্রন্থকার যে আত্মসাৎ করেছেন, সমালোচক এ তথ্যটিও তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। এইসব অভিযোগের তথ্যভিত্তিক দৃঢ়মূল প্রতিবাদ আশা করেছিলাম বিদগ্ধ গ্রন্থকারের কাছে, কিন্তু নিরাশ হতে হয়েছে। সুতরাং অধ্যাপক নাথকথিত তাঁর তাস্কর্যবৃত্তির (plagiarism) অভিযোগটি প্রতিষ্ঠিত সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

আজাদ সাহেব উপস্থাপিত সাক্ষ্যও দুর্বল। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ পশ্চিম থেকে অনেক গ্রহণ করেছেন একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেখানে পাওয়া যাবে না কোনো অস্বীকৃত অনুবাদ। কোনো সাহিত্যই পুষ্ট হয়ে উঠতে পারে না অন্য দেশের সংস্পর্শ ও প্রভাবকে অস্বীকার করে। সাহিত্যে দ্বীপমন্যতা (insularity) মহাকবি গ্যেটের কাছেও ছিল অসহনীয়। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'—এটা ছিল তাঁরও আদর্শ। বলেছেন, 'Left to itself every literature will exhaust and its' vitality if it is not refreshed by the interest and contribution of a foreign one'—বিশ্বসাহিত্যের পক্ষে এটিই মর্মকথা। তাই বলে "Faust" কাব্যটি অনুবাদ করে নিজের নামে চালালে মহাকবি হওয়া যায় না; সম্ভবত যা করতে চেয়েছেন সমালোচিত গ্রন্থটির বিদগ্ধ গ্রন্থকার।

অজিতকুমার চক্রবর্তী
গরিফা (নৈহাটি)

৩

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

"চতুরঙ্গ" (১৯৮৯) প্রকাশিত অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের "দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর" শীর্ষক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটি পড়ে তৃপ্ত হলাম। প্রাবন্ধিক মানুষ রামেন্দ্রসুন্দরের যে নিটোল ও সামগ্রিক জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছেন তা চতুরঙ্গের পাঠকসমাজকে তৃপ্তিদান করবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর কেন এবং কিভাবে দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরে পরিণত হলেন, প্রাচ্যের অধিবিদ্যক ও বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রবল প্রবক্তা রামেন্দ্রসুন্দরের সাথে পাশ্চাত্যের ভাববাদী দর্শনতত্ত্বের অনুবর্তক হেগেল, প্লেটো, গ্রীন প্রমুখের মৌলিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোথায়, ব্রহ্ম সম্পর্কিত বৈদান্তিক তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক রামেন্দ্রসুন্দরের সাফল্য, বিফলতা ইত্যাকার আলোচনায় প্রাবন্ধিক যে জ্ঞাননিষ্ঠ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর সাফল্যেরই দ্যোতক। প্রাবন্ধিক এটি প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, বিজ্ঞানের যে সীমাবদ্ধতা অনুভব করে রামেন্দ্রসুন্দর দর্শনজিজ্ঞাসায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন দর্শনের সেই সীমাবদ্ধতা ও খণ্ডিত জ্ঞানই দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরকে নিক্ষেপ করেছিল স্ববিরোধিতার আবর্তে। জগৎ ও জীবনের নানাবিধ মৌলিক প্রশ্নের উত্তরদানে বিজ্ঞান অধিবিদ্যক দর্শনের যুক্তি যে বড়ই দুর্বল তা পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দরের চর্চা ও গবেষণায় ধরা পড়ে। তাই তিনি তাঁর "জগতের অস্তিত্ব" গ্রন্থে অসহায় উক্তি করেছেন: 'বিদ্বস্তুর মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই।'

উনবিংশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্বে বাঙলার নব জাগরণে সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের অনিবার্যতা ছিল অনস্বীকার্য। সমাজতাত্ত্বিক ভাবনায় তিনি ছিলেন অতি নির্মল ও স্বচ্ছ মনের অধিকারী। এই মহান মণীষার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনার্থে বাঙালী সাহিত্য-প্রেমীদের পক্ষ থেকে ডঃ দীপিকা মজুমদার অর্পণ করেছেন তাঁর গবেষণাগ্রন্থ: Ramendra Sundar Trivedi—His Social and Political Ideas যার নির্মোহ মূল্যায়ন করেছেন রণেন্দ্রনাথ দেব। তিনি ধন্যবাদযোগ্য।

মোঃ সানাল্লাহ্
কৌচা, বর্ধমান

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।